KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ মাঘ, ১৩৬৭ ফাল্গুন, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সাফল্যের পথে

মাত্র তিন বছরের মধ্যে ধানক্ষেত ও জলাভূমিময় একটি
বিজন প্রদেশ দুর্গাপুরের বিশাল ইস্পাত কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে।
অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ এই কাজ সম্ভব করে তুলেছে ইস্কন। এই
যৌথ-প্রতিষ্ঠান তেরটি ব্রিটিশ বাণিজ্য-সংস্থার সমবায়ে গঠিত।
এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই ইস্পাত কারখানা নির্মিত হচ্ছে।
নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এই ইস্পাত কারখানা দশ লক্ষ
ইন্‌গট টন ইস্পাত এবং ভারতের বহু শ্রমশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী
বিভিন্ন ধরনের তৈরী মাল উৎপাদন করতে পারবে।

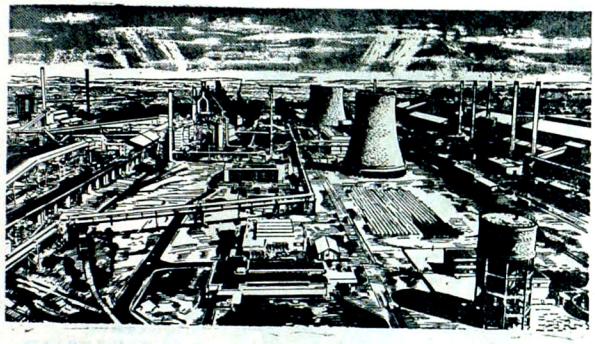

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ

ডেভি এবং ইউনাইটেড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ
দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টমসন্-হস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক
কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিটান-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট
কোম্পানি লিঃ স্যর উইলিয়াম এ্যারল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
ক্লিভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ
(ব্রিজ অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ
ইস্কন্ কেব্‌ল্ গ্রুপ (সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং
সিমেন্স জেনারেল কেব্‌ল্ ওয়ার্কস্ লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ISCON-38 BEN

অষ্টম বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা **সমকালীন** অগ্রহায়ণ তেরশ' সাতষট্টি

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ-বিধান ॥ অমিয়নাথ সান্যাল ৪৮৩

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর ৪৯৩

বাংলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্র ॥ অলোক রায় ৪৯৭

গণিতের দর্পণে : গ্রীস ॥ মুরারি ঘোষ ৫০৩

চিঠিপত্রে কীটসের শেষের দিনগুলি ॥ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১০

রবীন্দ্র রচনা-সূচী ॥ পুলিনবিহারী সেন ও পার্থবসু ৫১৫

সমালোচনা ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রথীন্দ্রনাথ রায়। ৫১৯

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অষ্টম বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা সমকালীন অগ্রহায়ণ তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ-বিধান

অমিয়নাথ সান্যাল

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপদিষ্ট 'নাট্যসংগ্রহ' নামে মূল প্রস্তাবনার মধ্যে 'রঙ্গ' নামে উল্লিখিত বিষয় রঙ্গগৃহ-নির্মাণ, রঙ্গদেবতা-পূজন, ও পূর্বরঙ্গ এই তিনটি অনুবিষয় সূচিত করে। এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি ৫ অধ্যায়গত পূর্বরঙ্গ আলোচ্য।

নিতান্ত সহজ বুদ্ধি দিয়ে 'পূর্বরঙ্গ' শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যায়। সর্বপ্রথমে নাট্যগৃহ নির্মাণ আবশ্যক। পরে সেই নবনির্মিত নাট্যগৃহে মাত্র একবার রঙ্গ-দেবতার পূজা বিহিত। এর পরে কি বিনা প্রস্তুতি, ও পরীক্ষায় অকস্মাৎ 'রঙ্গ' অর্থাৎ সামাজিক সর্বসাধারণের শ্রব্য-দৃশ্য উপভোগ্য নাট্য পরিবেশন করা সম্ভব? কখনই নয়। অতএব—রঙ্গ বা নাট্য পরিবেশনের **পূর্বে** 'পূর্বরঙ্গ' নামে কর্ম অবশ্য সাধনীয়। পূর্বরঙ্গ হল নাট্যের 'রিহার্শ্যাল্'। অনুশীলনা করে বুঝা যায়, **পূর্বরঙ্গ * হল "ফেজ্‌ড্ রিহার্শ্যাল"** এবং **কমপক্ষে তিনবার অনুষ্ঠেয়।** পূর্বরঙ্গের সংজ্ঞা যথা যস্মাদ্রঙ্গপ্রয়োগোঽয়ং **পূর্বমেব প্রযোজ্যতে**।

তস্মাদয়ং পূর্বরঙ্গো দ্বিজেয়োঽত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ ৫ অঃ।

সরলার্থ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে হেতু এই রঙ্গপ্রয়োগ (অর্থাৎ পূর্বরঙ্গ) পূর্বেই (সামাজিক সাধারণের সুখার্থে অনুষ্ঠেয় নাট্য প্রয়োগের পূর্বে) প্রযোজ্য (বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তার কারণে, প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদনীয়) অতএব এই (পূর্বপ্রয়োগাধীন) পূর্বরঙ্গ (পূর্বরঙ্গ-বিধি) বিজ্ঞেয় (নাট্য প্রযোক্তাগণের পক্ষে)

'প্রযোজ্যতে' ও 'প্রযুজ্যতে' শব্দের মধ্যে অর্থ-ইঙ্গিত ঘটিত পার্থক্য আছে। চৌ-সংস্করণে 'প্রযোজ্যতে' আছে। 'যুজ্' ধাতুর অর্থ যোগ করা। কিন্তু বিশিষ্ট স্বার্থ বা বস্তু সিদ্ধির উদ্দেশে 'যোগ' বিহিত হয় তখন 'প্রযোজ্যতে' শব্দই সার্থক। যথা পায়স পাকার্থে দুগ্ধ, তণ্ডুল ও শর্করা প্রযোজ্য; না হ'লে পায়স নামে বস্তু সিদ্ধ হয় না। অতঃপর, তেজপত্র, এলাচ, কিশমিশ, কর্পূর যোগ করা যেতে পারে; এরূপ 'যোগ' যোগমাত্র; প্রয়োগ নয়। এরূপ যোগ না করলেও 'পায়স' বস্তুর সিদ্ধি হয়। কিন্তু পায়সে প্রযোজ্য বস্তু সকলের প্রয়োগ না ঘটলে, তেজপত্রাদি যোগে পায়স হয় না।

তাৎপর্য দ্বারা বুঝা যায়, ভবিষ্যত বা পরিণাম-নাট্য কর্মের স্বার্থ চিন্তা করে পূর্বেই পূর্বরঙ্গ প্রয়োজ্য। **পূর্বরঙ্গ ব্যাপার অবলা-বাল-গোপাল তোষণী হলে, পূর্বরঙ্গ বিধানের পক্ষে বক্ষ্য মান বিধি সকল উপদিষ্ট হ'ত না।**

পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ-বিধান অবশ্যই জটিল। জটিল হওয়ারই কথা। কারণ, পরিণাম-নাট্যকর্মের মুখ্য প্রয়োগগুলি একে একে ও সামান্য থেকে আরম্ভ করে বিশেষ ভাবে নিষ্পাদিত ও পরীক্ষাধীন করাই উপদিষ্ট হয়েছে। বারম্বার ও বিভিন্ন প্রকার কার্যসূচী সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে উপদেশ করতে হলে উপদেশ-গ্রন্থন জটিল হতে বাধ্য। ৫ অধ্যায়ে, ১৪৯ শ্লোকের শেষার্ধ যথা—এতৎপ্রমাণং নির্দিষ্টমুভয়োঃ পূর্বরঙ্গয়ো ॥

মাত্র এই শ্লোক থেকে বুঝতে পারা যায়, এই শ্লোক পর্যন্ত উপদেশের মধ্যেই দুই প্রস্থ পূর্বরঙ্গ কর্মের প্রামাণিক নির্দ্দেশ সাধিত হয়েছে। সর্বশুদ্ধ শ্লোক সংখ্যা ২১৪। উক্ত ১৪৯ শ্লোকের অব্যবহিত পরে, পুনরায় (১৫৮ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বিশেষ ভাবে) তৃতীয় প্রস্থ পূর্বরঙ্গ কর্মের ও তদ্ব্যপদেশে 'শুদ্ধ' ও 'চিত্র' পূর্বরঙ্গ-কর্মের সম্বন্ধে নির্দেশ করা হয়েছে। অতঃপর, অর্থাৎ 'চিত্র' নামে পূর্বরঙ্গ কর্ম সাধিত হ'লে (১৬৩ শ্লোক পর্যন্ত) স্থাপক পুরুষের প্রবেশ, প্রস্তাবনা কর্ম ও কিছু প্রাসঙ্গিক কর্মের উপদেশ আছে (১৭১ শ্লোক পর্যন্ত)। অতঃপর, পুনরায় শ্লোক যথা—

প্রস্তাব্যৈবং তু নিষ্কামেৎ কাব্য প্রস্তাবকো দ্বিজঃ।
এবমেষঃ প্রযোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো যথাবিধি ॥ ১৭১ ॥

সুতরাং—পূর্বরঙ্গ কর্ম যে বারবার তিন বার (ন্যূনপক্ষে) এবং সরল শুদ্ধ কর্ম থেকে ক্রমশ জটিল ও চিত্রকর্ম দ্বারা সাধ্য এ বিষয়ে কোনও তর্ক বা আপত্তির অবকাশই নেই। একই দিবসে যে তিন বার পূর্বরঙ্গ কর্ম সাধনীয়, এমন কিছু নির্দেশ নেই। বরং—অনুমান হয়, প্রাথমিক পূর্বরঙ্গ কর্মদ্বয় একই দিনে সাধিত হ'তে পারে। কিন্তু—চিত্র নামে পূর্বরঙ্গ গীত-বাদ্য-নৃত্ত সহযোগে সাধ্য বলে, এবং চিত্র কর্মের মধ্যে চিত্রতাণ্ডব প্রযোজ্য

* ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষকৃত নাট্যশাস্ত্রের ইং অনুবাদ গ্রন্থের ৭৭ ও ৭৮ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হলাম। সেখানে অভিনব গুপ্তের ব্যাখ্যা-প্রামাণ্য বলে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের সারোদ্ধার করা হয়েছে। সার যথা, পূর্ব রঙ্গের প্রথম নয়টি অঙ্গ সাধারণী স্ত্রীলোক (কমন্ উইমেন্) শিশু, এবং নির্বোধ জনের (ফুল্স্) বিনোদার্থে উপদিষ্ট।

আমার সুচিন্তিত মত এই যে আমরা নিরতিশয় হতভাগ্য। কারণ, মূল গ্রন্থ এবং প্রসঙ্গ-সঙ্গতি (কনটেক্স্ট্) উদ্ধার না করে, অপরের কৃত পাইকারি হারে মন্তব্য উদাহরণ করেই নিশ্চিন্ত হওয়ার সংস্কার অভ্যাস করেছি। নাট্যশাস্ত্রে ২৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক থেকে ৬২ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে "প্রেক্ষকবর্গের" ("প্রেক্ষকাণাং তু লক্ষণম্" ইত্যারম্ভ) অর্থ, **বিশিষ্ট গুণ-লক্ষণসম্পন্ন প্রেক্ষক (ক্রিটিক্) পুরুষ সকল।** সাধারণ নাট্যদর্শক নয়। অতঃপর, ৬১ ও ৬২ শ্লোকে বলা হয়েছে যে উক্ত প্রেক্ষকগণ অবশ্যই সাধারণ নাট্যদর্শক ব্যক্তিগণের রুচি-ভেদ ও মনোভাব বিষয়ে অবগত হবেন। যথা শূদ্র ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, বাল্যাবস্থ, মূর্খ ও স্ত্রীলোক। **এস্থলে পূর্বরঙ্গের প্রসঙ্গ-সঙ্গতি আদৌ নেই।** পুনশ্চ, ৫৯ ও ৬০ শ্লোকে বৃদ্ধ, বালক-স্ত্রীবর্গ, তথা, তরুণবয়স্ক (কামে বিদগ্ধাঃ) অর্থার্জন পরায়ণ, এবং মোক্ষপরায়ণ নাট্যদর্শকের (প্রেক্ষকের নয়) উল্লেখ আছে; লক্ষণ বর্ণনার প্রয়োজনই নেই। মাত্র দুটি শ্লোকে এতগুলি লোকের নাম, আর প্রধানত, ৭টি শ্লোকে প্রেক্ষকের গুণ-লক্ষণ বর্ণনার প্রয়োজন বুঝলে, পূর্বরঙ্গ কর্মকে অবলা-বাল-গোপাল তোষণী প্রচেষ্টা মনে করা যায় না। **পূর্বরঙ্গে এ সকল বা কোনও নাট্যদর্শক উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু প্রেক্ষকাদি নাট্য-সংসদীয়** (২৭ অঃ ৫৬ শ্লোক) **ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন।**

* কা-সংস্করণে "প্রযুজ্যতে" আছে। অর্থে ইতরবিশেষ হয়।

হওয়ার কারণে, অন্য দিবসে বিশেষ করে মাত্র চিত্র-পূর্বরঙ্গ কর্ম বিহিত হয়েছে। এই প্রয়োগকে শেষ-প্রয়োগ বলা হয়েছে। প্রমাণ শ্লোক যথা—

চিত্রস্তুমস্য বক্ষ্যামি যথাকার্যং প্রযোক্তৃভিঃ।
কার্যং নাতিপ্রসঙ্গোঽত্র গীতনৃত্তবিধিং প্রতি ॥ ১৬০ ॥
গীতে বাদ্যে চ প্রবৃত্তেঽতিপ্রসঙ্গতঃ।
খেদো ভবেৎ প্রযোক্তৃণাং প্রেক্ষকাণাং তথৈবচ ॥ ১৬১ ॥

ভাবার্থ। চিত্র পূর্বরঙ্গের চিত্রত্ব প্রসঙ্গ করছি। পূর্বরঙ্গ-প্রযোক্তাগণ অবশ্যই চিত্রকর্ম প্রয়োগ করবেন। কি হেতু? নাটক-প্রকরণাশ্লিষ্ট নাট্যে বহুবিধ চিত্র-কর্ম আছে। সেই কর্মসকল অত্র চিত্র-কর্মাবসরে পরীক্ষনীয়। পরীক্ষা করবেন প্রেক্ষকবৃন্দ। প্রেক্ষকবৃন্দ অর্থ সাধারণ দর্শক নয়। ২৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক থেকে ৬২-৬৩ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে, সর্বশুদ্ধ ১৩টি শ্লোক মাত্র প্রেক্ষকবৃন্দের গুণ-লক্ষণ বর্ণনায় অভিনিবিষ্ট হয়েছে। অতঃপর—গীত-নৃত্ত বিষয়ে যে বিধি সকল পূর্বে বলা হয়েছে, সেই বিধির অতিপ্রসঙ্গ করা উচিৎ নয়। এবং গীত-বাদ্য-ও নৃত্তের কর্ম-প্রবর্তনাও অতি-প্রসঙ্গবর্জিত হওয়া উচিৎ। অতিপ্রসঙ্গের দুবার উল্লেখের হেতু কি?

পূর্বরঙ্গ পরিণাম নাট্য নয় বলেই অতিপ্রসঙ্গ বা হীনপ্রসঙ্গের কথা উঠতে পারে। **পূর্বরঙ্গ কর্ম হল বিভক্ত রূপে পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান।** এর মধ্যে প্রত্যেক কর্মের পরীক্ষায় অল্পবিস্তর অতিপ্রসঙ্গ হতে পারে। কিন্তু—চিত্র পূর্বরঙ্গ কর্মে আদ্যোপান্ত প্রায় সমস্ত নাট্য কর্মই পরীক্ষণীয়, অধিকন্তু ধ্রুবাগীতি, বাদিত্রপ্রয়োগ ও তাণ্ডব-নৃত্তও সাধনীয় ও পরীক্ষণীয়। সুতরাং—এই তিন বিষয়ে শিল্পী ও প্রেক্ষক অতিপ্রসঙ্গ করে কার্যগুলিকে অধিকতর শ্রম-সাধ্য করবেন না। একই দিনে, তিনবার পূর্বরঙ্গ সাধন করাই অতিপ্রসঙ্গ। বারবার একই গীত, বা নৃত্ত বা বাদ্য যোগ অনুষ্ঠান করা বা পরীক্ষা করা অতিপ্রসঙ্গ। অতিপ্রসঙ্গ করলে কি দোষ?

গীত বাদ্য নৃত্তে অতিপ্রসঙ্গ করলে শিল্পী ব্যক্তিদের খেদ অর্থাৎ কায়িক সন্তাপ আবির্ভূত হয়। পূর্বরঙ্গে অতিপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। নাট্যকর্মের প্রয়োগ পরম্পরা সুনিয়ত ও বৈচিত্র্যযুক্ত; এ স্থলে পরীক্ষার প্রশ্নই নেই। কিন্তু—পূর্বরঙ্গের কর্মপরম্পরা নাট্যকর্ম পরম্পরা থেকে ভিন্নতর। **এবং —বিশিষ্ট কালের মধ্যে পূর্বরঙ্গকর্ম সমাপ্ত করতে হবে এরূপ নিয়মও নেই।** সুতরাং—পূর্বরঙ্গ প্রযুক্ত কর্ম তথা পরীক্ষা কার্যের ও অতিপ্রসঙ্গ সম্ভব। না হয় অল্প-বিস্তার কায়িক সন্তাপই হ'ল! ক্ষতি কি?

খিন্নানাং রসভাবেষু স্পষ্টতা নোপজায়তে।
ততঃ শেষপ্রয়োগস্তু ন রাগজনকো ভবেৎ ॥ ১৬২ ॥ ৫ অঃ

ক্ষতি আছে; পরীক্ষা বিষয়ক ক্ষতি। শিল্পী ব্যক্তিরা এই তৃতীয় কর্ম উপলক্ষে গীত-বাদ্য-নৃত্ত দ্বারা রস-ভাবের স্পষ্টতা সাধিত করে পরীক্ষার যোগ্য করেন; এবং গান্ধর্ব-প্রয়োগ দ্বারা রাগ বা রঞ্জনা সৃষ্টি করেন ও সেই রাগ বা রঞ্জনা পরীক্ষাধীন হয়। শিল্পীরা খিন্ন হলে কর্মে শৈথিল্য বা বিকার দেখা দেয়। প্রেক্ষক-পরীক্ষকগণ ও বার বার ও শ্রম-সাধ্য পরীক্ষা-বিচার করতে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ফলে এই শেষ-প্রয়োগ, অর্থাৎ গান্ধর্বসহকৃত চিত্র-পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ প্রেক্ষকদের প্রত্যক্ষে রঞ্জনাকারক হয় না। ফলে, পুনরায়, ও আদ্যোপান্ত চিত্র-পূর্বরঙ্গ কর্ম অনুষ্ঠেয় হয়।

শেষ-প্রয়োগ অর্থ চিত্র-পূর্বরঙ্গের প্রয়োগ। শেষ-প্রয়োগ অর্থ পরিণাম-নাট্য প্রয়োগ

নয়। কারণ—শেষ প্রয়োগটি পরীক্ষা করে প্রেক্ষকবৃন্দ ক্রমিক ভাবে সমস্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে সমালোচনা করে তিনরূপ মন্তব্য করেন। ২৭ অধ্যায়ে এই তিন রূপ মন্তব্য সুন্দর বাক্যে উপদিষ্ট হয়েছে। (৯৯, ১০০, ও ১০১ শ্লোক)। প্রথমত: উত্তম প্রয়োগ অর্থাৎ সার্থকনামা প্রয়োগ হয়েছে কি না। দ্বিতীয়ত, উত্তম প্রয়োগের অধিকন্তু 'সমৃদ্ধি' নামে লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়েছে কিনা। তৃতীয়ত, প্রয়োগ ও সমৃদ্ধির অধিকন্তু—অলঙ্কার-সিদ্ধি হয়েছে কিনা।

এ তিন বিষয়ে পূর্বরঙ্গ-কর্ম উত্তীর্ণ হ'লে, তখনও নাট্য প্রয়োগ আরভ্য নয়। কারণ—তখন ও পূর্বরঙ্গের অধিকৃত 'স্থাপক' ব্যক্তি দ্বারা স্থাপনা-প্রস্তাবনা-বিভাগীয় কর্ম অবশিষ্ট থাকে। এরূপ কর্মাবসরে প্রেক্ষকবৃন্দের মধ্যে মতভেদ হওয়া সম্ভব বলেই, ২৭ অধ্যায়ে (৬৩ শ্লোক থেকে ৬৮ শ্লোক বিশেষ করে) প্রাশ্নিক নামধেয় মীমাংসাকারী পুরুষবৃন্দের প্রসঙ্গ করা হয়েছে। এঁরা সমস্ত মতভেদ বা সংঘর্ষ সুমীমাংসিত করে দিলে—সেই মীমাংসার আনুগত্যে স্থাপনা-প্রস্তাবনাদি কার্য সুপরিকল্পিত হয়।

অতঃপর—পরিণাম-নাট্যপ্রয়োগের দিন-ক্ষণ নির্ধারিত হয় (২৭ অধ্যায়ে ৮৫ থেকে ৯৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই কার্যটি পূর্বরঙ্গ কর্মের বহির্ভূত।

যে দিন পরিণাম-নাট্যানুষ্ঠান উদ্দোধিত হয়, সে দিন পরীক্ষা-মূলক পূর্বরঙ্গ বলতে কিছুই আরম্ভ হয় না। সৌদিন,—সূত্রধার কর্তৃক নান্দীপাঠ, এবং স্থাপনা ,প্রস্তাবনা অঙ্গ দুটি যথা সংক্ষেপে আচরিত হয় এবং যবনিকা উদ্‌ঘাটন পূর্বক, প্রথম অঙ্ক শ্রব্য-দৃশ্য রূপে আবির্ভূত হয়।

যাই হ'ক—নাট্যপ্রয়োগ ব্যাপারটি সংকল্প মাত্রেই ত্বরিত সাধ্য নয়। একই দিনে, কোনও প্রকারে অবলা-বাল-গোপাল তোষণার্থে পূর্বরঙ্গের প্রথম নয়টি অঙ্গের সমাধা করেই পরিণাম-নাট্যপ্রয়োগের চিন্তা বাতুলেরই মস্তিস্কে আবির্ভূত হতে পারে।

বরং—সিদ্ধান্ত এই হয় যে **পূর্বরঙ্গব্যাপারটি আদ্যোপান্ত "ফেজ্‌ড্ রিহার্শ্যাল্"।**

পূর্বরঙ্গ বিধানের জটিলতার কারণ

প্রথমত, পদ্ধতি ক্রমিক উপদেশ আরব্ধ হয়ে, অকস্মাৎ, ঐতিহ্যগত একটি আখ্যান অস্থানে প্রবেশ লাভ করেছে। **দ্বিতীয়ত**, এই আখ্যান প্রসঙ্গের উপসংহার রূপে পুনরায় আঠার প্রস্থ দেবদানবাদি-গণের তোষণ ব্যাপার পঠিত হয়েছে, যা থেকে মনে হয়, পূর্বরঙ্গ কর্মবিশেষ দ্বারা এসকল দেবতাকে তোষণ না করলে রঙ্গ কর্মেরই হানি হবে।

তৃতীয়ত, পূর্বোক্ত আখ্যান অনুযায়ী "নিগদীত বাদ্য" প্রসঙ্গ অবতারণা করেই, অকস্মাৎ (৫৮-৫৯ শ্লোকে*) একটি কথা বলা হয়েছে, যা ঐ স্থানে সঙ্গতি হীন, কিন্তু প্রণিধানযোগ্য।

যা বিদ্যা যানি শিল্পানি যা গতি র্যচ্চ চেষ্টিতম্।
লোকালোকস্য জগতঃ তদিহাস্মিন নাটকাশ্রয়ে॥

শ্লোকের ভাবার্থ। লৌকিক ও অলৌকিক জগতের পক্ষে যত কিছু উত্তম বিদ্যাঘটিত সংস্কার, উত্তম শিল্পঘটিত সংস্কার, যত কিছু উত্তমা গতি (লক্ষ্য, গন্তব্য) ও প্রযত্ন সাধনীয় হতে পারে, তা সমস্তই এই বক্ষ্যমান নাটকাশ্রিত নাট্যে নিদর্শিতব্য।

বাক্যটি অতিরঞ্জিত নয়। ২০ অধ্যায়ে নাটক-লক্ষণ পাঠ দ্বারা বুঝা যায় মনুষ্য-সম্ভব মনন-শ্রবণ দর্শন রাজ্যের এরূপ মহতী ব্যাপ্তি অন্য কোনও কাব্য-বন্ধ বা নাট্যে সম্ভব নয়। এক

* অধিকাংশ শ্লোক পক্ষে সংখ্যা-করণ বিপর্যস্ত। সুতরাং পাঠক ও অনুশীলক নিরন্তর সতর্ক হবেন। নাট্যশাস্ত্রের সম্পাদনা ও সংস্করণ কাদের হাতে পড়ে কবে এই বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, এইটেই একটা গবেষণা বা থিসিসের যোগ্য বিষয়।

কথায়—নাটকীয় নাট্যের পূর্বরঙ্গ কর্ম সর্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং—নাট্য প্রযোক্তার পক্ষে প্রথমেই নাটকীয় নাট্যের উদ্দেশ্যে পূর্বরঙ্গ কর্ম চেষ্টা করা উচিত নয়।

বাক্যটি স্বপ্রধানভ্রষ্ট। যোগ্যস্থান হ'ল—১৪৯ শ্লোকের অব্যবহিত পরে। ১৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে।

এতৎ প্রমাণং নির্দিষ্টমুভয়ঃ পূর্বরঙ্গয়োঃ ॥ ১৪৯ ॥ ৫ অঃ। অর্থাৎ—এতাবৎ উপদিষ্ট উভয় প্রকারে পূর্বরঙ্গ পক্ষে প্রমাণ (স্টান্ডার্ড্) নির্দিষ্ট করা হ'ল। উভয় যথা—'আরম্ভ' থেকে ১৪০ শ্লোক (১৪১ ও বটে) পর্যন্ত সাধারণ পূর্বরঙ্গ-কর্মের প্রমাণ সকল। মানুষী-সিদ্ধি সংশ্রিত যাবতীয় কাব্য-বন্ধ নাট্যের পূর্বে এই সকল উপদেশ গ্রাহ্য। দ্বিতীয়—১৪২ শ্লোক থেকে ১৯৪ শ্লোক মধ্যে—দিব্য-মানুষী-সিদ্ধি সংশ্রিত প্রকারণাদি কতিপয় নাট্যের কিছু বিশেষ পূর্বরঙ্গ-বিধান।

অতঃপর—নাটকাশ্রিত পূর্বরঙ্গের প্রমাণ-নির্দেশ **আরম্ভ হয়েছে** ১৫০ শ্লোক থেকে। নাটকাশ্রিত নাট্যের পূর্বরঙ্গ কর্মপক্ষে যা কিছু বিশেষ, মাত্র তারই প্রসঙ্গ। বলা হয়েছে,

তনানু লক্ষণং প্রোক্তং পুনরুক্তং ভবেদ্ যতঃ ॥ ১৫১ ॥ ৫অঃ।

অতএব—মনে হয়, —১৫২ শ্লোকের পরে নাটকাশ্রিত নাট্যের পূর্বরঙ্গের দুরূহতা সূচনার্থে পূর্বোলিখিত "যা বিদ্যা যানি শিল্পানি" ইত্যাদি শ্লোকটি উপস্থাপনীয়।

নাটকাশ্রিত নাট্য দৈবিকী সিদ্ধি কামনা করে। উৎকৃষ্ট প্রকরণও নাটক সদৃশ। অতএব—নাটকীয় পূর্বরঙ্গের মধ্যে দুই ভাগ করা হয়েছে। 'শুদ্ধ' (নরম্); দ্বিতীয় চিত্র।

শুদ্ধ পূর্বরঙ্গে সবিশেষ গীত-বাদ্য-নৃত্ত প্রযোজ্য ও পরীক্ষণীয়। **চিত্র পূর্বরঙ্গে,** সম্ভব স্থলে 'বর্ধমানক' নামে নৃত্ত যোগ (৪অঃ ১৪, ১৫, ১৬ শ্লোক; সংখ্যা করণ বিপর্যস্ত; ৩১ অঃ ২২৯ শ্লোক থেকে ২৬৬ শ্লোক পর্যন্ত) এবং পিণ্ডীবন্ধ-নৃত্ত যোগ উপস্থাপনীয় ও পরীক্ষণীয়। পিণ্ডীবন্ধ-নৃত্ত হ'ল "গ্রুপ্-ডানস্" বা "ওয়লস্" জাতীয় ব্যাপার। যাই হ'ক—এর পরে কেউ বলতে পারবেন না যে—প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতি কখনও গ্রুপ্-ডান্‌স্ বা কম্‌নিটি-ডান্‌স্ বা 'ওয়লস্' নৃত্ত কল্পনা বা পরিকল্পনা করেনি। ৪ অধ্যায়ে ২৮৫ ও ২৮৬ শ্লোকে চাররকম পিণ্ডীবন্ধের নাম-লক্ষণ পড়লে 'লতাবন্ধ' প্রকারটি "ওয়ল্‌স্" সদৃশ মনে হয়। এ স্থলে নামই লক্ষণ। **পিণ্ডবন্ধ নামটি যদি কোন ও কারণে ভ্রুতিকটু মনে হয়, (অথবা আধুনিক কালে আতঙ্ক-জনক মনে হয়) তাহলে আমি ঐ নামের পরিবর্তে "স্তবকনৃত্ত"** অভিনব নামটি প্রস্তাব করে রাখলাম।

শুদ্ধ ও চিত্র পূর্বরঙ্গ কর্ম সমাপ্তির পরে, নাটক-প্রকরণের মর্যাদা অনুযায়ী উত্তম স্থাপনা, প্রস্তাবনাদি ব্যাপার নিষ্পাদিতব্য ও পরীক্ষণীয় সমালোচনীয়। অতঃপর—শ্লোক যথা—উত্তরার্ধে—

এবমেষ প্রযোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো যথাবিধি ॥ ১৭১ ॥ ৫অঃ এস্থলে এষ অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার ও তৃতীয় বার অনুষ্ঠিত পূর্বরঙ্গ কর্ম।

অতঃপর—১৭৫ শ্লোক থেকে ২১৪ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে প্রকীর্ণ ভাবে বস্তু-লক্ষণ ও প্রয়োগের উপদেশ আছে। এগুলি আদৌ প্রক্ষেপ নয়। কারণ, এগুলির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে।

পূর্বরঙ্গের অঙ্গ-বিভাগ

সমগ্র পূর্বরঙ্গ ব্যাপার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রথম, কুতপ-বিন্যাস পূর্বক (রঙ্গ

*[৪ অঃ-২৪৯ শ্লোক থেকে ২৫৭ পর্যন্ত। আধুনিক কালে প্রযুক্ত "ঝনক্ ঝনক্ পায়েলিয়া" চলচ্চিত্র-নাট্য আমি প্রথম, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী পিণ্ডবন্ধ-নৃত্ত দেখলাম। অন্যে এ রকম নৃত্তপ্রয়োগ অন্য কোনও নাট্যে দেখেছেন কিনা, জানি না।।

পীঠের উপর গালিচা বিছিয়ে আসর তৈরী করা) প্রত্যাহারাদি ক্রমে আসারিত পর্যন্ত কর্মব্যবস্থা। দ্বিতীয় —উত্থাপনাদি মহাচারী-প্রয়োগ পর্যন্ত সাধনীয় ও পরীক্ষণীয় কর্ম-বিভাগ। তৃতীয়— স্থাপন-প্রস্তাবনা পর্ব।

দ্রষ্টব্য যে, যাবতীয় কাব্য-নাট্য তিন রকম। **প্রথম** ও সমৃদ্ধতম হল নাটক **যার** উদ্দেশ্য হ'ল দৈবিকী সিদ্ধি। **দ্বিতীয় হ'ল** শ্রেষ্ঠ প্রকরণ বিশেষ যার উদ্দেশ দিব্য-মানুষী সিদ্ধি এবং **তৃতীয় হ'ল**—অঙ্ক-ব্যায়োগাদি অবশিষ্ট কতিপয়, যার উদ্দেশ্য হল মানুষী সিদ্ধি।

পূর্বরঙ্গের যে তিনটি সাধারণ ন্যূনকল্প বিভাগ বিকল্পিত হল—সেগুলি, সর্ব নাট্য পক্ষে সাধারণ পূর্বরঙ্গ।

কিন্তু—সর্বপ্রকার কাব্য-বন্ধাশ্রিত নাট্যপক্ষে একাধিক বার পূর্বরঙ্গ কর্ম সাধ্য এমন কথা নয়। যেগুলি নাট্য-গান্ধর্ব পরিকল্পনায় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, সেগুলির পক্ষে একাধিক দিবসে ও একাধিক বার পূর্বরঙ্গ কর্মগুলি সাধনীয়,—যাবৎ পর্যন্ত প্রেক্ষকবর্গ ঐ কর্মসকলকে, "প্রয়োগ" "সমৃদ্ধ" ও "অলঙ্কার" সিদ্ধি বিষয়ে উত্তীর্ণ মনে না করেন (২৭ অধ্যায় শেষ চারটি শ্লোক)।

যেরূপ নাট্যাশ্রিত পূর্বরঙ্গ হ'ক, এবং যতবারই পূর্বরঙ্গ কর্ম সাধনীয় হ'ক, প্রাথমিক **পর্যায়ের কর্মসূচী প্রতিবারই পালনীয়।** কারণ—প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মই বাদ্যাশ্রিত, এবং অবশিষ্ট কিছু গীত-নৃত্যাশ্রিত, এবং—প্রতিদিনের অভ্যাস দ্বারা সাধনা সংরক্ষণীয়। এ এবিষয়ে কাব্যবন্ধ-নাট্যভেদে ইতর-বিশেষ করা হয়নি।

প্রথম বিভাগের সাধনীয় কর্মাঙ্গ (ইং ফিচার) যথা—প্রত্যাহার, অবতরণ, পরিগীত ক্রিয়া-রম্ভ অথবা সংক্ষেপে আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গোৎসারিত, ও আসারিত। এই হল নবাঙ্গ কর্মসূচী।

দ্বিতীয় বিভাগের সাধনীয় কর্মাঙ্গ যথা—উত্থাপন-ক্রিয়া, পরিবর্তন, নান্দীপাঠ অবকৃষ্টা-ধ্রুবা প্রয়োগ, রঙ্গদ্বার প্রবর্তনা, চারী প্রয়োগ, মহাচারী প্রয়োগ।

তৃতীয় বিভাগের অনুষ্ঠেয় কর্মাঙ্গ যথা—ত্রিগত প্রয়োগ, প্ররোচনা দ্বারা স্থাপনা-প্রস্তাবনা।

প্রথম বিভাগের সাধারণ পরিচয়

পূর্ব ঐতিহ্য অনুসারে এই নয়টি অঙ্গ "বহির্গীত" নামে আখ্যাত ছিল। 'বহির্গীত' সম্বন্ধে কাহিনী পরে আলোচ্য। যাই হ'ক— এতানি চ বহির্গীতান্যন্তর্যবনিকাগতৈঃ।

প্রযোক্তৃভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাণ্ডকৃতানি তু ॥ ১১ ॥ ৫অঃ।

অর্থাৎ—এই নয়টি বহির্গীত তন্ত্রী (কোনও বীণাদি তন্ত্রীবাদ্য এবং ভাণ্ডবাদ্য) পুরস্কৃত হবে, এবং অন্তর্যবনিকাগত প্রযোক্তৃগণ দ্বারা প্রযুক্ত হবে।

তাৎপর্য। বহির্যবনিকা উদ্‌ঘাটিত আছে। কিন্তু, দ্বিতীয় অন্তর্যবনিকা উদ্‌ঘাটিত নয়। সেই অন্তর্যবনিকার অন্তরাল কুতপ-বিন্যাস হয়েছে, (প্রত্যাহার)। অতঃপর, গায়কবর্গের নিবেদন (অবতরণ) হয়েছে। রঙ্গপীঠের সম্মুখে উপবিষ্ট নাট্যসংসদ উক্ত ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করেন না,, অন্তর্যবনিকা-গতত্বের কারণে। বহিরাগত "কমন্ উইমেন্" "চিল্‌ড্রেন্" এবং "ফুল্‌স"* আখ্যাত ব্যক্তিদের উল্লেখ নেই, আবির্ভাবের সম্ভবনাও নেই, আবির্ভূত হলেও তারা প্রত্যক্ষ কিছু দেখতে পারবে না।

যাই হক—অন্তর্যবনিকার অন্তরালে দুটি নেপথ্য-দ্বারের নিকটে "ভাণ্ড" নামে যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। যন্ত্রটি চর্মাচ্ছাদিত ও দুন্দুভিসদৃশ বাদনীয়। গায়কগণ যখন বহির্গীতে

প্রযোজ্য গান আরম্ভ করেন, তখন একটি বীণা (অথবা চিত্রা) এবং উক্ত ভাণ্ডবাদ্যের সহযোগ আরম্ভ হয়। ইতি পরিগীত-ক্রিয়া। অতঃপর —

ততশ্চ সর্বকুত পৈ র্যুক্তান্যন্যানি কারয়েৎ। বিঘাট্য বৈ যবনিকাং নৃত্তপাঠ্য কৃতানি চ ॥ ১২ ॥

অর্থ। তদনন্তর (অন্তর্যবনিকাগত ভাবে) সর্বকুতপাশ্রিত প্রযোক্তগণ দ্বারা অন্যান্য (আশ্রাবণাদি আসারিত পর্যন্ত) অঙ্গ-সকল নিষ্পাদিতব্য। এবং—অন্তর্যবনিকা অপসারণপূর্বক নৃত্ত-পাঠ্য করণীয় সকল ও (নিষ্পাদিতব্য)।

অতঃপর—বহির্গীত সংশ্লিষ্ট গীতক ও নৃত্তপ্রয়োগের সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ যথা—

গীতানাং মদ্রকাদীনামেকং যোজ্যং তু গীতকম্।
বর্ধমানমথাপীহ তাণ্ডবং যত্র যুজ্যতে ॥ ১৩ ॥

অর্থ। মদ্রাকাদি গীতসকলের মধ্যে মাত্র একটি গীতক যোজনা করা উচিত। অথ, (অভিনবব্যসূচক ভাবে) যেখানে তাণ্ডবের যোজনা হবে, সে স্থানে বর্ধমান-যোগও নিষ্পাদিতব্য। তাৎপর্য। মদ্রক অর্থে সংকেতক গীত সকল। এই অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টান্ত যথা—

ঝণ্ডে ঝণ্ডে দিল্লগ্ দিগ্‌লে।
জম্বুকবলিতক তেত্তেন্নাম্ ॥
পাদতলাহত পাতিতশৈলং, ক্ষোভিতভূতসমগ্রসমুদ্রম্।
তাণ্ডবনৃত্তমিদং প্রলয়ান্তে, পাতু হরস্য সদা সুখদায়ি ॥

এর মধ্যে নৃত্তপদাঘাত, ও নৃত্তচ্ছন্দের সংকেত আছে। **প্রথম শ্লোকটি নৃত্তপাঠ্য। দ্বিতীয় শ্লোকটি গেয়।**

এই পর্যন্ত (১৩ শ্লোক পর্যন্ত) পূর্বরঙ্গ-কর্মের প্রথম বিভাগের সাধারণ পরিচয় মাত্র।

অতঃপর—পূর্বরঙ্গ কর্মের দ্বিতীয় বিভাগের সাধারণ পরিচয় যথা—

ততশ্চোত্থাপনং কার্যং পরিবর্তকমেব চ।
নান্দী শুষ্কাপকৃষ্টা চ রঙ্গদ্বারং তথৈবচ ॥ ১৪ ॥
চারী চৈব ততঃ কার্যা মহাচারী তথৈবচ।

অর্থাৎ। তদনন্তর, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাপকৃষ্টা (শুষ্কাবকৃষ্টা ইতি পাঠান্তর ও আছে) এবং রঙ্গদ্বারং, তদনন্তর চারী ও মহাচারী কর্তব্য।

এই অংশকে দ্বিতীয় ভাগ মনে করার হেতু এই যে—উত্থাপনাদি মহাচারী পর্যন্ত কার্যসকল শিল্পী দ্বারাই নিষ্পাদিতব্য, এবং এই বিভাগীয় কার্যে সূত্রধার ও স্বয়ং শিল্পীবৎ কার্য করেন।

যথার্থত, উদ্ধৃত ছয়টি চরণই ॥ ১৪ ॥ শ্লোক রূপে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। "তথৈবচ" শব্দ দ্বারা এই বিভাগের অর্থগত নিবৃত্তি সূচিত হয়।

অতঃপর—পূর্বরঙ্গ কর্মের তৃতীয় বা শেষ বিভাগের সাধারণ পরিচয় যথা —

ত্রিকং প্ররোচনা চাপি পূর্বরঙ্গে ভবন্তি হি ॥ ১৫ ॥
এতান্যঙ্গানি কার্যাণি, পূর্বরঙ্গবিধৌ তু চ।

অর্থাৎ। (অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত মহাচারী প্রয়োগ তথা অত্র) অপি চ ত্রিকং ও প্ররোচনা (নামে কার্য) পূর্বরঙ্গে সাধিত হয়। বিশেষ করে পূর্বরঙ্গের বিধিগত অনুষ্ঠান পক্ষে এতৎ সর্ব অঙ্গ প্রয়োগ করা উচিত।

---

* ডক্‌টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রণীত ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য। ত্রিক ও প্ররোচনা কার্য দুটির সঙ্গে পূর্বোক্ত গায়ক বাদক নর্তক ও অভিনয় শিল্পীদের সম্বন্ধ নেই। যাই হক, বিশেষ করে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠান বিধির অনুগত হয়ে (ন তু রঙ্গ বা নাট্য বিধির অনুগত হয়ে) এই সমস্ত অঙ্গ কর্ম প্রয়োগ করা উচিত।।

সর্বসাকল্যে—সাধারণ-বিধি পক্ষে উল্লিখিত অষ্টাদশ অঙ্গ কর্ম প্রযোজ্য। সাধারণ বিধির অবিরোধে উক্ত অঙ্গ-কর্মের পক্ষে যথাযোগ্য প্রত্যঙ্গ-কর্মও বিহিত হয়েছে। প্রত্যঙ্গ কর্মে ভেদ ঘটার পক্ষে কারণ এই যে সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কাব্যবন্ধ সকলেরই নাট্যপ্রয়োগেও ভেদ ঘটে। সুতরাং—পূর্বরঙ্গানুষ্ঠিত পরীক্ষা-বিচারের বিষয়েও ভেদ ঘটতে বাধ্য।।।

পূর্বরঙ্গ পরিকল্পনা ও নাট্যপরিকল্পনার ভেদ

প্রথম—পূর্বরঙ্গের প্রাথমিক নয়টি অঙ্গ-কর্ম ন্যূনাধিক রূপে সর্ব নাট্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু—নাট্যপ্রয়োজনে উক্ত বস্তু সকলের পরিবেশন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে সম্পাদিত হয়। দৃষ্টান্ত করে বলা যায়—ভোজ-ব্যাপারে বহুবিধ ভোজ্যের পাক নিষ্পন্ন হয়। সেই পাকনিষ্পত্তির স্বকীয় ক্রম আছে। অতঃপর—সুপক্ক ভোজ্য সকল ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। শেষে পরিবেশনের কালে ভিন্ন প্রয়োজনবশে ভিন্ন ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সমক্ষে ভোজ্য সকল পরিবেশিত হয়। অনুরূপ ভাবে —পূর্বরঙ্গের প্রাথমিক গীত-বাদ্য-নৃত্তাদি ও নাট্যপ্রয়োগ কালে গীত-বাদ্য-নৃত্তাদির পরিবেষণ বিষয়ে ভেদ আদর্শিত হয়েছে।

একটি উদাহরণ আলোচ্য। কুতপ-বিন্যাস (গালিচা-পাতা) ব্যাপার পূর্বরঙ্গ পক্ষে যেরূপ করা হয়, তার পরিবর্তনের আবশ্যক হয় না। কারণ—গায়কবৃন্দ ও বাদকগণের স্থান পরিবর্তন আবশ্যক নয়। কিন্তু—কোনও নাট্যের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বহু প্রকার কর্মের সুবিধা-অসুবিধা সম্ভব-অসম্ভব বিচারপূর্বক উক্ত কুতপ সকলের অবস্থান, অবস্থান-ভেদ, এমন কি অপসারণ ও কার্য। গান্ধর্বসংগ্রহে গীত-বাদ্য বিষয়ক উপদেশ অনুধাবন করলে এর যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে।

দ্বিতীয়—পূর্বরঙ্গের সাধারণও দ্বিতীয় বিভাগে 'রঙ্গদ্বার' পর্যায়ে অভিনয় কার্য আছে। কিন্তু—সেই অভিনয় মাত্র বাচিক ও আঙ্গিক অংশের অভিনয়; তার সঙ্গে আহার্য (কেয়ূর-কুণ্ডলাদি প্রয়োগ) ও সত্ত্বাভিনয় থাকে না ("যস্মাদভিনয় স্তত্র প্রথমং হ্যব—তার্যতে। রঙ্গদ্বার-মতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্॥" ২৬ ও ২৭ শ্লোক, ৫ অধ্যায়)। প্রথমবার অনুষ্ঠিত পূর্ব-রঙ্গে মাত্র বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অপরাপর অভিনয়াদি প্রযুক্ত হয় (যাকে ড্রেস্-রিহার্শ্যাল্ বলে)। নাট্য ব্যাপারে, বলাই বাহুল্য, এ রকম "ভাগ-করা" প্রয়োগ হয় না।

তৃতীয়—পূর্বরঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য হল পরিণাম-নাট্য প্রযোজ্য যাবতীয় কর্মসকলকে পূর্বরঙ্গে বিভিন্নতঃ প্রয়োগ করে পরীক্ষা ও বিচারাধীন করা। পূর্বরঙ্গের তৃতীয় বিভাগে ত্রিগত ও প্ররোচনা অঙ্গেই এ কার্যটি নিষ্পন্ন হয়। **'ত্রিগত'** অর্থাৎ **প্রেক্ষকবর্গ** (পরীক্ষকবর্গ,—২৭ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোক থেকে ৫৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তর) **প্রাশ্নিকবর্গ** (মীমাংসকবর্গ—২৭ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোক থেকে ৬৯ শ্লোক পর্যন্ত) এবং **সূত্রধারবর্গ** (সূত্রধার, আচার্য ও পারিপার্শ্বিক—৩৫ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ থেকে ৫২ শ্লোক পর্যন্ত), ইতি তিন প্রকার নাট্য বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তির সমবায়। নিয়ম মত—প্রত্যেক বর্গের তিনজন করে ন্যূনপক্ষে নয়জন ব্যক্তির সমাবেশই "ত্রিগত" অর্থাৎ ত্রিবর্গের প্রত্যেকের ত্রি-সংখ্যান অধিগত (যাকে "কোরাম্" বলা যায়)।

বলাই বাহুল্য—পরিণাম-নাট্যকর্মের অব্যবহিত পরে প্রেক্ষকাদি সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করেন। **নাট্যের পক্ষে সর্বশেষে 'ত্রিগত' বা 'প্ররোচনা' বলতে কিছুই নেই; কোনওকালেই নেই।**

পূর্বরঙ্গে পরীক্ষার দিঙ্‌নির্ণয়

এই ব্যাপারটি ২৭ অধ্যায়ে ৯৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে যথা সংক্ষেপে অথচ সুন্দর ভাবে উপদিষ্ট হয়েছে। প্রথমেই—পরীক্ষাধীন বিষয়-বিভাগ যথা—

যথা সমুদয়শ্চৈব প্রয়োগাশ্চ সমৃদ্ধয়ঃ।
পাত্রং প্রয়োগমর্থঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তু এয়ো গুণাঃ ॥ ৯৬ ॥ ২৭ অঃ।

অর্থ। (যে নাট্যে যেরূপ ভূমিকায় যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ পাত্রগণের) যথা সমুদয় (অর্থাৎ যোগ্য আবির্ভাব), এবং প্রয়োগ সকল, এবং সমৃদ্ধিসকল, (প্রকারান্তরে) পাত্র প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য, এই তিনটিই কিন্তু—গুণ সকল (যা প্রেক্ষকাদি ত্রিগত পুরুষবর্গ প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা ও বিচার করবেন)।

তাৎপর্য। সংক্ষেপে, মাত্র তিনটি গুণ-সমবায় পরীক্ষণীয়। প্রথম, ভূমিকা-পাত্র গত যোগ্যাযোগ্যতা নির্ধারণ করে গুণের পরীক্ষা। দ্বিতীয়, নাট্য গান্ধর্ব কর্মের প্রয়োগের দোষ-নির্ধারণ করে গুণের পরীক্ষা। এবং তৃতীয়—অর্থ বা উদ্দেশ্যগত সিদ্ধি লাভ (মানুষী, দৈবিকী ও দিব্য মানুষী) বিষয়ে দোষগুণ পরীক্ষা করে গুণের গ্রহণ। অতঃপর—পাত্রগত গুণ যথা—

বুদ্ধি সত্ত্বস্বরূপঞ্চ লয়তালজ্ঞতা তথা।
রসভাবজ্ঞতা চৈব বয়ঃস্থত্বং কুতূহলম্ ॥ ৯৭ ॥ ঐ।
গ্রহণং ধারণং চৈব গানং নাট্য কৃতং তথা
জিতসাধ্বসতোৎ সাহাবিতি পাত্রগতো বিধিঃ ॥ ৯৮ ॥ ঐ ।

ভাবার্থ। পাত্রগত পরীক্ষার বিধি অনুসারে গুণ সকল যথা—বুদ্ধি (স্বকর্মে অধ্যবসায়) সত্ত্ব (দিব্য মানুষ্যাদি ভূমিকা পক্ষে তজ্জাতীয় অভিনয় কর্ম) স্বরূপ (ব্যক্তিগত ভূমিকানুযায়ী অভিব্যক্ত রূপ), লয়-তালেজ্ঞতা, রস-ভাবজ্ঞতা (ভূমিকাভিনয় কর্মে যথেষ্ট রস-ভাবাদির জ্ঞান বা জ্ঞাপনা) বয়ঃস্থত্ব (যেরূপ ভূমিকা, তদনুরূপ বয়োধর্মের অভিনয়) কুতূহল (স্বকর্মে আগ্রহ,) গ্রহণ (যে রূপ ভূমিকা গ্রাহ্য, সেইরূপ গ্রহণ) ধারণ (গৃহীত ভূমিকা চরিত্রে অবস্থিত হওয়া) নাট্যকৃত গান (অভিনেয় গান) জিতসাধ্বসতা (ভয়াদি মানসিক আবেগ বিরহিত) ও উৎসাহ। ইতি।

অতঃপর প্রয়োগসংশ্লিষ্ট গুণের পরীক্ষা—

সুবাদ্যতা সুগানত্বং সুপাঠ্যত্বং তথৈব চ।
শাস্ত্রকর্মসমাযোগঃ প্রয়োগঃ স তু সংজ্ঞিতঃ ॥ ৯৯ ॥ ঐ

অর্থ। বিশিষ্ট (অর্থাৎ পরীক্ষা-বিচারাধীন) প্রয়োগের সংজ্ঞা যথা—যথাযোগ্য বাদ্যপ্রয়োগ (নাট্য কর্মের সহযোগ বা অনুষঙ্গ রূপে) যথাযোগ্য গান (পূর্বোক্ত অভিনেয় গীতের অতিরিক্ত ধ্রুবাদি গান) যথাযোগ্য পাঠ (বাচিক অভিনয়) এবং শাস্ত্রকর্মসমাযোগ (শাস্ত্র বিহিত কর্মের পরস্পর উত্তম যোগ)।

পূর্বরঙ্গ কর্মসকলের এই প্রয়োগ পর্যন্ত পরীক্ষা-বিচার নিষ্পন্ন হ'লে বুঝতে হবে—পূর্বরঙ্গ কর্মের দ্বিতীয় বিভাগে আঙ্গিক-বাচিক এবং সত্ত্বাভিনয় পরীক্ষিত হ'ল, অধিকন্তু বিশিষ্ট গীত—বাদ্য প্রয়োগও পরীক্ষিত হ'ল। **দ্বিতীয়বার পূর্বরঙ্গানুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল।**

অতঃপর—তৃতীয়বার পূর্বরঙ্গ কর্মানুষ্ঠানের সার্থকতা ও পরীক্ষা-বিচারযোগ্যতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যথা— সুবিভূষণতা যা তু সুমাল্যাম্বরতা তথা।

যাত্বঙ্গরচনা চৈব সমৃদ্ধিরিতি সা স্মৃতা ॥ ১০০

শ্লোকের প্রথম তু' শব্দটি প্রয়োগের অধিকন্তু 'সমৃদ্ধি' নামে আখ্যাত গুণের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

অর্থ। কিন্তু, (অভিনয় সৌকার্যার্থে) সুযোগ্য ভূষণ; তথা সুযোগ্য মাল্য-বেশ পরিধান, অধিকন্তু, বর্ণ-প্রসাধন এই তিনটি ব্যাপার গুণোত্তীর্ণ হ'লে তাকে সমৃদ্ধি বলা হয়।

তাৎপর্য। শ্লোকোক্ত ব্যাপার সকল ২৩ অধ্যায়ে সবিস্তারে উপদিষ্ট হয়েছে। বর্ণরঞ্জনা পক্ষে 'তু' শব্দের সার্থকতা আছে। মনুষ্য-ভূমিকায় পাত্র-পাত্রীগণের বর্ণরঞ্জনা পক্ষে প্রত্যক্ষই সহজ প্রমাণ। এ রকম বর্ণরঞ্জনা সামান্যাভিনয়ের অধিকৃত। কিন্তু—অপর দুইটি বিষয়ও আছে, যে বিষয়ে বর্ণরঞ্জনা দ্বারা পুরস্কৃত অঙ্গরচনার প্রয়োজন উপদিষ্ট হয়েছে।

দেবগণ, দিব্যগণ, ও দিব্য-মনুষ্যগণ নায়ক হ'লে তত্তৎ সত্ত্বশীলানুযায়ী অঙ্গরচনা প্রযোক্তব্য। অধিকন্তু, যে অঙ্কে যে রসের সূচনা, সেই রসের সূচক বর্ণ (৬ অধ্যায়ে "অথ বর্ণাঃ" শীর্ষক ৪২ ও ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দ্বারা দৃশ্য-পরিবেশস্থ বস্তু বিশেষও বর্জিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিশেষভাবে ২৩ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোক থেকে ৮৮-৮৯ শ্লোক পর্যন্ত উপদেশ দ্রষ্টব্য। পুনশ্চ-বর্ণাঙ্গারচনা রূপ-সত্তার অনুসাধক। রূপ-সত্তার অনুষঙ্গ ভাবে ভূষণাদি যোজনাও প্রযোক্তব্য। দেবাদি অলৌকিক সত্তার পক্ষে বলা হয়েছে—এ পক্ষে আগমই প্রমাণ (২৩ অঃ ৪৩ শ্লোক)। "আগম" অর্থাৎ নাট্য-গন্ধর্বের গুর্বাচার সিদ্ধি, যা শাস্ত্রনিবদ্ধ অথবা শাস্ত্রাতিরিক্ত উভয় প্রকারেই গম্যমান হয়।

প্রসঙ্গত এই শ্লোক প্রধান ভাবে, নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ও ডিম নামক কাব্যবন্ধ—নাট্যের পূর্বরঙ্গ কর্ম তথা পরীক্ষার সূচনা করে। বিশেষতঃ এই সকল নাট্য "সমৃদ্ধির" অপেক্ষা করে। সমৃদ্ধির ইংরাজি অনুবাদ পক্ষে "ম্যাগনিফিশেনস্" বলা যায়। **এবং তৃতীয় (কিম্বা ততোধিক) বারে নিষ্পাদিতব্য ও পরীক্ষা-বিচার্য পূর্বরঙ্গকে ইং "ড্রেস রিহার্শ্যাল" বলাই উচিত।** অতঃপর—পরিশেষ বিচারেও আছে। যদা সর্বে সমুদিতা একীভূতা ভবন্তি হি।

অলঙ্কারঃ স তু তথা মন্তব্যো নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥ ১০১ ॥ ঐ

অন্বয়ই যদা (পাত্র প্রয়োগগুণে নির্ধারণানন্তরং পুনঃ) সর্বে (নাট্য-গন্ধর্বাশ্রিতঃ এব সর্বে বিচারীভূতাঃ গুণাঃ) সমুদিতাঃ (পূর্বরঙ্গকর্মবসারে যুগপৎ পারম্পর্যেণ বা অবিভূর্তাঃ সন্ত) একীভূতাঃ (পরস্পরালম্বনত্বেন সমঞ্জসীকৃতাঃ এব ভবন্তি (প্রতীয়ন্তে সূত্রধারাদিসর্বপ্রেক্ষক প্রযোক্তৃভিঃ ইতি) তদা স এব একীভূতব্যাপারচমৎকারঃ বিশেষেণ অলঙ্কারঃ ভবতি তথৈব নাট্য-যোক্তৃভিঃ নির্ব্বন্দেন মন্যতে।

অর্থ। অতঃপর, পাত্রপ্রয়োগসংশ্লিষ্ট গুণ সকল পরীক্ষা-বিচারে উত্তীর্ণ হ'লে, যখন সর্ব নাট্য প্রযোক্তৃবৃন্দ দেখেন যে নাট্য-গান্ধর্বব্যাপারাশ্রিত, অর্থাৎ অভিনয়-গীত-বাদ্য-নৃত্ত প্রয়োগাশ্রিত সমস্ত গুণসকল পরস্পরালম্বন ভাব দ্বারা সমঞ্জস একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে, তখন তাঁরা মন্তব্য করেন যথা এই একীভূত চমৎকার ব্যাপার বিশেষ পরিণাম-নাট্য পক্ষে অলঙ্কার স্বরূপে গণ্য হ'ক।

তাৎপর্য। এই অলঙ্কার-সিদ্ধি হ'লে পুনরায় পূর্বরঙ্গ পরীক্ষা-কর্মের প্রয়োজন হয় না। "নাট্য যোক্তৃভিঃ মন্তব্যঃ" বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত এই হয়—এতৎ সমস্ত গুণ-বিচার পরিণাম—নাট্যের অনুষ্ঠানের পরে কোনও নাট্যসংসদ-বহির্ভূত সমালোচনার প্রসঙ্গ নয়। **বরং—পরিণাম নাট্যের পূর্বে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানে ও বারম্বার অনুষ্ঠান অবসরে তত্র উপস্থিত নাট্যসংসদই পরীক্ষাবিচার প্রয়োগ করেন। পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠান কালে নাট্যসংসদের অতিরিক্ত কোনও ব্যক্তিই উপস্থিত থাকেন না। পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিভঙ্গের পরিবেশন কালে সাধারণী স্ত্রীলোক, অবোধ বালক-বালিকা ও নির্বোধ জনসাধারণ উপস্থিত হ'ত বা থাকতে পারত এ রকম মন্তব্য সর্ব প্রমাণ বহির্ভূত ও অজ্ঞাতা প্রসূত।**

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

রাধাশ্যাম সিংহ

স্বদেশী আন্দোলন দেশে শুরু হলে কসবা কলিকাতার প্রান্তে থেকেও প্রথমে এর ধাক্কা যেন অনুভব করেনি। ঘূর্ণিবাতাস যেমন উড়তে উড়তে খড়কুটো একস্থান থেকে উড়িয়ে নানা স্থানে ছড়াতে থাকে ঘটনার দ্রুত বিবর্তন এই সংগ্রামের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত কর্ম্মিদের পৌঁছে দিচ্ছিল দিকে দিকে। এমনি এক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাধাশ্যাম সিংহ মহাশয় এসে পড়েছিলেন কসবায় একটি জাতীয়বিদ্যালয় স্থাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ে দেশের লোকেদের জীবনে স্বদেশীয়ানার প্রতিক্রিয়া হয় সর্বাঙ্গীণভাবে তীব্র ও গভীর। তাই ব্রিটেনের ছোঁয়াচলাগা সবকিছু ভারতীয়দের জীবনথেকে আবশ্যক বর্জনীয় বলে গণ্য করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতির কাঠামোয় গড়া সরকার পরিচালিত ও সরকারী সাহায্যে পুষ্ট স্কুলগুলিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকারি পাঠের অনুশীলন সে কারণে বাংলাদেশের জতীয়তাবাদের আদর্শের বাইরে বলে বাতিলের অঙ্কে পড়ে যায়। দেশের জ্ঞানীগুণীরা মিলে নতুন শিক্ষা প্রণালীর পরিকল্পনায় স্থাপন করেছিলেন "ন্যাশন্যাল কাউন্সেল্ অব এডুকেশান্" এবং তারই অনুমোদনে যাদবপুরে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়কে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কেন্দ্র করে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল

দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন স্বাস্থ্যবান ও গৌরকান্তি সিংহমহাশয় হাতকয়েক মাত্র লম্বা খদ্দরের ঝাড়নের আধোবাসে এবং অনুরূপ আর একটি কাপড়ের খন্ডকে চাদরের মত কাঁধে ফেলে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হলেন কসবায় এবং অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তাঁর সঙ্কল্প। কিন্তু উত্তরে শুনলেন যে স্কুল গড়বার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান তিনি করবেন কি উপায়ে। তিনি বললেন যে সে অর্থ সংগ্রহের জন্যেই তো তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। অনেকে ভেবেছিলেন যে এভাবে ভিক্ষালব্ধ অর্থে বিদ্যালয় গড়বার চেষ্টায় তিনি সারাজীবন শেষ করলেও এর ভিত্তিটুকু স্থাপন করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কসবার দিকে দিকে এমনকি প্রধান জনপথের দুধারে সে সময়ে কাঁটা জঙ্গল ভরা পোড়া জমি ছিল অপর্যাপ্ত। তারই খানিক মালিকদের কাছে সিংহমহাশয় চাইলেন একেবারে দান হিসাবে নয় স্কুলের প্রথম আস্থানার জন্য কেবল কয়েক বৎসরের স্থানাধিকার। প্রধান জনপথের প্রান্তে এক সহৃদয় কসবাবাসীর কাছ থেকে একখন্ড জমির সাময়িক অধিকার পেয়ে সিংহমহাশয় আরম্ভ করলেন বিদ্যালয় গঠনের অভিযান। ঐ রাস্তা দিয়ে তখন প্রতিদিন ইট, বালি, চুন ও শুরকীভরা গরুর গাড়ীর ক্যারাভান চলত অবিরাম। জমিতে দাঁড়িয়ে সিংহ মহাশয় চেঁচাতেন "গান্ধী মহারাজ কি জয়। এ গাড়োয়ান ভেইয়া স্বরাজকে লিয়ে চার ইটা দেও" বা থোড়া চুনা দেও বালু দেও, শুরকি দেও" ইত্যাদি। কিছুদিন পরে এই গাড়োয়ানদের কিছু বলবার আগেই তারা ঐ জমির পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছু ইট, চুন, বালি, শুরকি ইত্যাদি ফেলে যেত। ঘর তুলবার মত উপাদানের সংস্থান হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে আমন্ত্রণ করে এনে সিংহ মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করে কসবাবাসীদের

হতভম্ব করে দিলেন। "চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়" লেখা ও ভিতরে পয়সা ফেলবার ছিদ্র সমেত কয়েকটি টিনের বাক্স হাতে করে প্রতিদিন সিংহমহাশয় অর্থসংগ্রহে যেতেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনে আগত প্রত্যেক ষ্টেনের কামরা থেকে কামরায়। কিছুদিন পরে তাঁকে আর ঘুরবার প্রয়োজন হোত না বা কি আদর্শের জন্য এই ভিক্ষা তা ঘোষণা অপ্রয়োজনীয় হয়েছিল। বালিগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ ষ্টেশনের গেটে তিনি দু'হাতে দুটি বাক্স নিয়ে দাঁড়াতেন আর আগত বা বিদায়ী যাত্রীরা প্রত্যেকে আপন আপন সামর্থমত অর্থ দিয়ে যেত সেই বাক্সে। বিরামহীন সেই মুদ্রা ও বাক্সের ধাতব সংঘাতধ্বনি প্রচণ্ড বৃষ্টির আওয়াজের মত শোনাত। সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত সিংহমহাশয় ফিরতেন অর্থভারেপূর্ণ বেশ কয়েকটি টিনের বাক্স নিয়ে। পরে বাক্সের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে সেগুলি পৌঁছাত একটি কুলির বাহনে। অল্পদিনের মধ্যে এর পর এক বিরাট স্কুলঘর তৈরী হল আটচালায় টালির আচ্ছাদন পেয়ে। দেশ সেবায় অনুপ্রাণিত শিক্ষকের অভাব হয়নি এই বিদ্যায়তনে যাঁরা নামমাত্র বেতন নিয়ে এর পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ছাড়া সুতা-কাটা ও তাঁত বোনা ছাত্রদের শিক্ষার একটি অবশ্য করণীয় ছিল। প্রত্যেকদিন সকালে পড়াশুনা আরম্ভ হওয়ার আগে ছাত্ররা এক সারিতে দাঁড়িয়ে করত স্তোত্র ও গাইত জাতীয় সঙ্গীত। একটি গানের প্রথম ও শেষ ধুয়ায় আমরা গাইতাম —

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক .....
ও.....সে পুজার পুজারী মহাত্মা ভিখারী
ভিখারীর সাজে দাঁড়ায়ে দুয়ারে"

আমরা মহাত্মা গান্ধীকে না ভেবে আমাদের সামনে উপস্থিত ভিখারীর বাসে সজ্জিত সিংহ-মহাশয়কেই দেখতাম দেশসেবার সেরা পুজারী হিসাবে।

স্থানাতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের অঙ্গ বর্ধনের প্রয়োজন হয়েছিল অচিরে। আমরা ছাত্রের দল পালা করে টিফিনের সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে "গান্ধী মহারাজকি জয় গাড়োয়ানজী ইটা দেও, শুড়কি দেও" ইত্যাদি বলে সে সব উপাদানের সংগ্রহকে একটা উপভোগ্য খেলা হিসাবে নিয়েছিলাম।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংসর্গ যে কতখানি মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে তা পরিণত জীবনে, অতিবাহিত সময়ের দীর্ঘ বিস্তারে, দৃষ্টিপাত করলেই সহজে প্রতিভাত হয়ে থাকে। পাঠজীবনে পাওয়া শিক্ষকদের সকলের স্মৃতি সজীব থেকে যায় না, কিন্তু প্রত্যেকের মনে জাগ্রত থাকে দু একজন শিক্ষকের কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম তাঁদের সকলকেই আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাঁরা যে সকলে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তা বলব না, কিন্তু দেশের নবজাগরণ যেন তাঁদের যা কিছু গুণ ছিল সেগুলিকে এই বিদ্যায়তনের কাজে সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করেছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষকতাকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেননি এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ ব্রত। সব বিষয় ঠিকমত পড়াবার সরঞ্জামাদি না থাকলে ও বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ বোঝাতে আমাদের প্রধান শিক্ষকমহাশয়। তাঁর হাতের ভঙ্গিমায় ও বলবার বৈশিষ্ট্যে দুর্বোধ্য বিষয় ও যেন অতি সহজে বোধগম্য হোত। লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষক হবার মত গুণীদের সংখ্যা চিরকালই কম দেখা যায়। সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ গুণীদের মধ্যেও আমাদের এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে প্রচার করলে আমি মনে করিনা যে অত্যুক্তি করছি। চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্য যে তিনি মাত্র কয়েকবৎসর শিক্ষকতা করার

পর ল পাস করে আদালতে ওকালতি করতে চলে গেলেন। কেবলমাত্র শিক্ষাদানের নৈপুণ্যের জন্যই যে কোন শিক্ষকের স্মৃতি ছাত্রদের মনে সজীব থাকে এমন বলছিনা। আরো অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যও তাঁদের অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতি সহজে। একবার এক অসুস্থ শিক্ষকের স্থানে অস্থায়ীভাবে এলেন এক নূতন শিক্ষক। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে নানা রকমের গল্প করে তিনি ছাত্রদের মনোরঞ্জন করতেন। খুব জানা কাহিনীও তাঁর ব্যাখ্যায় নূতন বিষয়ে পরিণত হোত। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পাঁচমেশালী ভাষা। তাঁর এই প্রান্তীয় নানা ঢং এর বাংলা কথা বলার খিচুড়ী ভাষাকে চেষ্টাকৃত কৃত্রিমতা বলে মনে হয়নি কোনদিন। অথচ কিভাবে তিনি বলার এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন তা আজও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রয়ে গিয়েছে। আমাদের পাঠে অমনোযোগীতার জন্যে তিনি বলতেন "এইবার পাণিতুয়া খাবা" অর্থাৎ উপরে প্রচণ্ড চিমটি। কিন্তু এটাকে অদ্ভুত ভাষা হিসাবে না গ্রহণ করলেও তাঁর রামায়ণী কথাকে অতি সাধারণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি বলতেন "বুঝছেন রামায়ণ হইতেছে ইতিহাস। রাম বনে গিয়া বানরের সাথে মিতা করল কেন?—ইতিহাস। কারণ বনে ব্যাঘ্র আছিল, সর্প আছিল অতএব বৃক্ষারোহণ উচিত কর্ম। কিন্তু কৌশল না জানিয়া রাম গাছে চড়ব ক্যামায়। ঐ বানর আছিল সেই রামচন্দ্ররে শিখাইয়াছিল বৃক্ষারোহণ" ইত্যাদি।

চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লাবন কসবায় পৌঁছে গেল। বহির্জগতের ঘটনা নিরপেক্ষ গ্রামবাসীদের মধ্যে এল কংগ্রেস, এল সন্ত্রাসবাদ। যে ব্যায়ামের আখড়ায় কেবল শরীর চর্চ্চা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেখানে দেখা গেল নূতন অভিপ্রায়। সেবাসমিতি, হরিকীর্তন সভা, সাধারণ পাঠাগার ও গ্রাম্য বৈঠক প্রত্যহ আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেল জাতীয় অভিযানের ঘটনাবলী ও তার হিসাবনিকাশ। বিদ্যালয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে আলাপ ও জিজ্ঞাসা হঠাৎ গোপনীয় রূপ ধারণ করল। একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটির পাতা উল্টোতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম হলদিঘাটের যুদ্ধ বিবরণীর পৃষ্ঠার মধ্যে কে রেখে দিয়েছে লাল হরফে ছাপা রাষ্ট্রদ্রোহী ইস্তাহার। তাতে লেখাছিল ইংরাজশক্তির নিধন করো বোমা তৈরীর বিস্তারিত নির্দেশ এবং তার ব্যবহারের নানা উপদেশ। বিদ্রোহিবাহিনী পুষ্ট করতে অগ্রণী যাঁরা দাদার আখ্যায় তরুণ যুবাদের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা দেবার ভার নিচ্ছিলেন কসবার বেশ কয়েকজন যুবক তাঁদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের আস্তানায় তরুণদের ডেকে তাদের হাতে দেওয়া হোত সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা ইউরোপ ও রাশিয়ার বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংক্রান্ত পুস্তকাবলী এবং দেশ বিদেশের বিপ্লবী শহীদদের কাহিনী। বিদেশী বস্ত্র বর্জন, সরাবখানায় পিকেটিং ও লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলনে আহূত স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দিত করার জন্য গ্রামবাসীরা সম্মিলিত হতেন এই বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণে। এত অভিযান ও উত্তেজনার পরিবেশে থেকে তরুণ ছাত্রদের মনে হোত না যে চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয় শুধু একমাত্র বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র। দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে আগামীদিনের উপযুক্ত কর্মি হবার একটা আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাদের মনকে তোলপাড় করত অহরহ।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় উদ্বৃত্ত অর্থে পরে নূতন জমি কেনা এবং পাকা ইমারত গড়া সম্ভব হল এবং দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষাদপ্তরের আওতায় আসায় এর ব্যয় সংকুলানে ভিক্ষালব্ধ অর্থের আর প্রয়োজন হয়নি। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় নির্বাচিত সদস্যবর্গ সিংহমহাশয়কে জানালেন যে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষা করার ব্রতকে এখন ছুটি দিতে হবে এবং তিনি এই বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। সিংহ মহাশয় এই প্রস্তাবে মর্মাহত হলেন। যে বিদ্যায়তনের তিনি জনক আজ তার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ

হওয়ায় সেখানে কোন পদ গ্রহণ করে অবসর নেওয়ার চিন্তা তাঁর কাছে অতিশয় গ্লানিকর হয়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন আর এক অনুরূপ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আরম্ভ করবেন নূতন করে ভিক্ষা। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথমে ভিক্ষাপাত্র হাতে জনতার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এখন সে উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতায় তাঁর নূতন এই অভিযানে জনগণের কাছ থেকে আগের মত সাড়া ও সহানুভূতি তিনি পাননি। বিরাট কর্মবহুল জীবনে হঠাৎ অবসর এসে যাওয়ায় মানসিক ও দৈহিক অবসাদে পীড়িত সিংহ মহাশয়ের অল্পকয়েক বৎসর পরে মৃত্যু হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে কসবার চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের নাম থেকে জাতীয় শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে। যে আদর্শে হয়েছিল এই বিদ্যায়তনের গঠন ও প্রতিষ্ঠা আজ তার কণামাত্র খুঁজে পাওয়া যাবেনা এর বর্তমান পরিচালনায় ও উদ্দেশ্যে। এর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রচুর এবং ছাত্রসংখ্যাও বর্তমানে অনেকশতের অঙ্কে অসংখ্য। কিন্তু যে মহাত্মনের কৃচ্ছ সাধনায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্রতে চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গঠন সম্ভব হয়েছে তাঁকে স্মরণে রাখবার মত উপযুক্ত কোন প্রতীক এই বিদ্যায়তনে বা কসবায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য দেশ হলে এমন ব্যক্তির স্মরণার্থে শহরের কোন রাজপথ তাঁর নাম বহন করতো কিংবা কোন চত্বরে স্থাপিত হোত তাঁর প্রতিমূর্তি এবং কমপক্ষে অন্তত যে বিদ্যালয়ের তিনি স্রষ্টা তার প্রধান সভাগৃহ তাঁর নামে খ্যাত হোত। হতভাগ্য বাংলাদেশে কৃতজ্ঞতার অর্থটা কেবল অভিধানে লেখা আছে দেখা যায় বাস্তবে তার অভিব্যক্তি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী প্রতিভাবান ও কল্পনাপ্রবণ জাতি। কিন্তু কোন কারণে বলা যায় না তার চরিত্রে যেন স্যাডিসম্‌ ও ম্যাসোকিসম্‌ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দী যাবৎ। বাঙ্গালীর বীরত্বের উচ্ছ্বাস ইতিহাসে লিখিত আছে বারো ভুইঞার কাহিনীতে। কিন্তু সে বারো ভুইঞার অনেকে সমসাময়িক হলেও একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সিদ্ধিকল্পে একজোট হতে পারেননি এবং হলে পরে হয়ত আজ বাংলার ইতিহাস হোত ভিন্নতর। লোকে কথায় বলে একই হাতের পাঁচটা আঙ্গুল এক রকমের হয় না। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বাংলা মায়ের হাতে বাঙ্গালীজাত যে পাঁচটা আঙ্গুল হয়ে আছে তাতে দেখা যায় যে একটি অন্যের উৎপাটনকল্পে ডগা বাঁকিয়ে ভয় দেখাচ্ছে অবিরত। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর হলেও বাঙ্গালীর বিচিত্র স্বভাবের পীড়নকে এড়াতে পারেন নি। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনে আপন মনীষার পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও পূজা পেলেও শেষ জীবনে নিদারুণ খেদোক্তি করে গিয়েছেন যে "আমার বাঙ্গালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়—এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন—আমি ব্রাত্য আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্র সম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্মসঙ্গত"। যদি পুনর্জন্ম সত্যি হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে গুরুদেবের দেওয়া এমন পরিস্ফুট ইঙ্গিত পেয়ে ভবিষ্যতে মনীষী ও মহাত্মন আত্মাগুলি বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম যাতে না নিতে হয় তার জন্য সৃষ্টি কর্তার কাছে আবেদন পেশ করবে।

বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র

অলোক রায়

এলিয়ট তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত অন্‌ পোয়েট্রি এ্যান্ড পোয়েট্‌স্‌ গ্রন্থে সমালোচনা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিককালে ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যে এলিয়টীয় সমালোচনা ধারা বলে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মত প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এলিয়ট নিজে প্রধানত কবি, এবং সমালোচনা তিনি এতবেশি লেখেননি বা অন্যসমালোচকদের হাতে কলমে কিছু সমালোচনা লিখতেও শেখাননি যে তাঁকে এই নবতর ধারার পুরোধা অভিহিত করা হবে। অবশ্য তিনি নিজেই এর একটি কারণ নির্দেশ করেছেন—তিনি ছিলেন এযুগের একটি বিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যপত্র 'ক্রাইটেরিয়নে'র সম্পাদক: জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক সেই পত্রিকার লেখকেরা এলিয়টীয় সমালোচনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—এবং সেই পত্রিকাকে অবলম্বন করেই ইংরেজি সাহিত্যে এই নবতর সমালোচনা ধারার জন্ম— পত্রিকাই এখানে লক্ষ্য এলিয়ট উপলক্ষ মাত্র।

সবদেশের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে, শুধু সমালোচনাই বলি কেন, সাহিত্যের সবক্ষেত্রেই সাময়িক পত্রিকার একটি বিশেষ দান আছে। সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে একটি বিশেষ সাহিত্যিক গোষ্ঠী—অবশ্য পত্রিকার সম্পাদক বা পরিচালকের সেই ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা থাকে যার ফলে তিনি শক্তিমান সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করতে পারবেন, আর তারপর আপনা থেকেই পত্রিকার বিশেষ মত-পথ-আদর্শের সঙ্গে সমধর্মী একদল লেখক পত্রিকাকে অবলম্বন করে গোষ্ঠীটি গড়ে তোলেন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করে তোলেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে সেই পত্রিকায় রচনাগুলি প্রকাশের সাহায্যে। অবশ্য যে দেশে বা যে সমাজে লেখক মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বোধ অত্যন্ত প্রবল—সেখানে সম্পাদকের নেতৃত্বে গোষ্ঠী স্থাপনে তাঁরা উৎসাহিত হন না। ইংল্যান্ডে পত্রিকাকে অবলম্বন করে দল গড়ে ওঠা বা একটি বিশেষ ধারা গড়ে ওঠার নিদর্শন খুব কমই আছে—এলিয়টের 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকা যে গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল যুগ-কালগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের আকস্মিক পরিবর্তনে দেশে যে চিন্তার বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, সেই মূল্যবোধজনিত সাধর্ম্যই এই লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য এনে দিয়েছিল।

বাংলাদেশে ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ খুব সুলভ নয়। তাই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে যখনই কোনো শক্তিমান ব্যক্তিত্ব একটি পত্রিকাকে অবলম্বন করে বিশেষ মত এবং পথের প্রচারে ব্রতী, তখনই তাঁর আশে পাশে সমধর্মী সাহিত্যিক এসে জড়ো হয়েছেন এবং সেই পত্রিকাগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের গতিকে কোনো একটি বিশেষ পথে প্রবাহিত করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' 'সাধনা', প্রমথ চৌধুরীর "সবুজপত্র" এবং দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল' পত্রিকায় আমরা এরই নিদর্শন দেখেছি।

বাংলা গদ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাংলা পত্রিকাও জন্ম নিয়েছে। তবে একেবারে আদিপর্বের সেই পত্রিকাগুলির নামের সঙ্গে 'সংবাদ' এবং 'সমাচার' শব্দের আত্যন্তিক যোগ থেকেই বোঝা যায় যে, সেযুগের পত্রিকাগুলির সংবাদ পরিবেশনই ছিল মুখ্য কাজ। দিগ্‌দর্শন

(১৮১৮)· সমাচার দর্পণ (১৮১৮), বেঙ্গল গেজেটী(?) গস্পেল ম্যাগাজিন(১৮১৯), ব্রাহ্মণ-সেবধি (১৮২১), সংবাদ কৌমুদী (১৮২১) ও সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২) পত্রিকায় তাই সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন খুব কমই দেখা গেছে। ধর্মগত বিরোধ এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাগুলিতে বেশ গরম গরম প্রবন্ধ প্রকাশিত হোতো—এবং রামমোহন রায় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বাংলা গদ্যের সুলেখকেরা তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলিতে সাহিত্য-প্রকাশ দুর্লভ ছিল। সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্র—এই দুইয়ের আংশিক মিলন ঘটালেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮৩১ সালে, যখন তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করলেন। সংবাদ প্রভাকরে সংবাদতো প্রকাশ হোতোই, উপরন্তু প্রত্যেক সংখ্যাতেই গদ্যে-পদ্যে মিলে কিছু সাহিত্য চর্চাও হোতো। বিশেষ করে মাসপয়লার সংখ্যাটি ছিল সংবাদ প্রভাকরের সাহিত্যসংখ্যা। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় কবিতা লিখতেন—তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ও পদ্য লেখার হাতমক্স করতেন এই পত্রিকায়। এই শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁদের সকলেরই দীক্ষা ঈশ্বর গুপ্তের কাছে না হলেও 'সংবাদ প্রভাকর' লেখক গোষ্ঠীর বিশেষ সাধর্ম দ্বারা গ্রথিত ছিলেন তাঁরা। এইখানে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনীগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধারাবাহিক ভাবে তিনি তাঁর পত্রিকায় রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশরথী রায় প্রভৃতির জীবনী এবং সংক্ষিপ্ত কাব্য সমালোচনা প্রকাশ করেন (১৮৫৪-৫৫)।

১৮৪৩ সালে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সাহিত্যরচনা আরও বেশি স্থান পেল। যদিও ধর্মমূলক এবং দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশেই 'তত্ত্ববোধিনী'র একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের নাম অবশ্য স্মরণীয়। অক্ষয় দত্ত সুন্দর গদ্য লিখতেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে লেখা—একটি খোলা যুক্তি গ্রাহ্য মন,—আর তাঁর গদ্যও তাই সহজ অথচ মননশীল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' যে সব রচনা প্রকাশ করা হোতো তার একটি বিশেষ উচ্চমান ছিল· প্রবন্ধ নির্বাচনে সম্পাদকই যথেচ্ছাচার করতে পারতেন না। একটি 'প্রবন্ধ নির্বাচন সভা' ছিল পত্রিকার, যাঁর পাঁচজন করে সদস্য থাকতো, তাঁরা সকলে লেখা পড়ে তবেই মনোনীত করতেন প্রকাশের জন্য। বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দ বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি এই নির্বাচনী সভার সদস্য ছিলেন। এই জাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে রচনা প্রকাশের ফলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অগভীর প্রবন্ধ এবং রচনায় ভাষার দৌর্বল্য প্রকাশ পেতো না।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষা সৌষম্য ও ভাবসম্পদের জন্য পত্রিকাটি সেকালের কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত হয়েছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভার্ণাকুলর লিটরারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হজসন প্র্যাটি' সীটনকার পাদরি লঙ এবং রবিনসন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সমিতির আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় এইই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা ছিল যে এইই প্রথম সাহিত্য পত্রিকার জন্ম হোলো। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মত ধর্মদর্শন সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি এখানে প্রধান নয়, 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনের প্রথম পংক্তি ছিল 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র একটি বিশেষ স্থান আছে শুধু এই জন্যই যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ধর্মদর্শন সমাজতত্ত্ব রাজনৈতিক প্রবন্ধকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধানতঃ 'সাহিত্যাদিদ্যোতক' পত্রিকারূপেই এর

প্রকাশ ঘটালেন। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান ইতিহাস রহস্যকাহিনী বিদেশীগল্প ইত্যাদিই বেশী ছাপা হোতো। কিন্তু বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকেও এই পত্রিকা অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্য সম্বন্ধে এতে সুন্দর সাহিত্য সমালোচনা বেরিয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন বিবিধার্থসংগ্রহের সম্পাদক, তখন তিনি বিবিধার্থসংগ্রহে (আষাঢ় ১৮৭৩ সন) দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকখানির বিস্তারিত অলোচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান এই সাহিত্যালোচনার ফলেই কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হন, এবং পত্রিকাখানির অকাল মৃত্যু ঘটে।

সোমপ্রকাশের (১৮৫৮) প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও কিছু কিছু লিখতেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নিজে যদিও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতেরাই প্রধানতঃ সোমপ্রকাশে লিখতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসিক গঠনের দিক থেকে পত্রিকাটি বহুলাংশে বিদ্যাসাগরের সমধর্মী ছিল। অর্থাৎ বেকনের 'এ্যাড্‌ভান্সমেন্ট অব লার্‌নিং' এর অনুবাদক দ্বারকানাথ এই পত্রিকায় বিশুদ্ধ রাজনীতির গরম গরম প্রবন্ধও লিখতেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন সাংবাদিক—এবং সংবাদ-সাহিত্যে তিনি আসল কৃতিত্ব দেখান।

'তত্ত্ববোধিনী'-'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও "সোমপ্রকাশ" ছিল গম্ভীর ধরণের কাগজ। ব্যঙ্গ রচনা কখনো কখনো সেগুলিতে প্রকাশিত হলেও তার প্রাধান্য ছিলনা। সেদিক দিয়ে বরং এঁদেরও আগেকার পত্রিকাগুলি অর্থাৎ সমাচার চন্দ্রিকা বা সংবাদ কৌমুদী বা সংবাদ প্রভাকরের বেশী প্রতিষ্ঠা ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তবে এইসব লেখার সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অল্প। হালকা লেখা যাতে ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ আছে, কিতু জ্বালা নেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এমন রচনার জন্মদাতা প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। 'মাসিক পত্রিকা'র ভাষা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করলো। কথ্যভাষার রীতিতে কাব্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফরাসী শব্দের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদের গঠনে সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ—এইই হচ্ছে 'মাসিক পত্রিকা'র রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক সংখ্যার শীর্ষে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হোতো—এই পত্রিকা জনসাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে· যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' শুধু জনসাধারণ, বিশেষ করে স্ত্রী-লোকদের পড়বার জন্যই 'মাসিক পত্রিকা'র প্রস্তাবগুলি চলিত শব্দপূর্ণ হাল্‌কা ভাষায় লেখা হয়নি, বাংলা চলিত ভাষা শিক্ষার্থী ও বাঙলা সমাজের জ্ঞানলাভেচ্ছু সাহেবদের ব্যবহারে লাগানো, কতকগুলি প্রস্তাব রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাংলায় প্রথম উপন্যাস লেখা হয়েছে এই পত্রিকায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।'

তারপর বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র একের পর এক উপন্যাস লিখলেন। ১৮৭২এ জন্ম নিল স্বনামধন্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক। পত্রিকাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার কথা আগে বলেছি,—সাহিত্যিক গোষ্ঠী এর আগেও ছিল, কিতু এই প্রথম তার পূর্ণতা প্রাপ্তি। অর্থাৎ পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সাহিত্যরচনার প্রভাব দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগ সৃষ্টি করলেন। উপন্যাসেতো বটেই, প্রবন্ধ সমালোচনাতেও সেযুগের সব লেখক বঙ্কিমকে অনুকরণ করেছেন। বঙ্কিম একটি ধারার জন্ম দিলেন। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনাকালে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের নাম ও কয়েকটি

লেখা স্মরণ করতে পারি। কবি হেমচন্দ্রের লেখা—'মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়?', যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের 'কোম্‌ৎদর্শন', 'জাতিভেদ,' রামদাস সেনের "ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত" "কালিদাস" 'বাণভট্ট'; ললিতমোহন বিদ্যানিধির "ভারতবর্ষীয় আর্যগণের আদিম অবস্থা বিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ"; প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভাষার উৎপত্তি' 'কোমৎদর্শন' "ঐতিহাসিক ভ্রম" বিদ্যাপতি"; অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা' 'গ্রাবু' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঐতিহাসিক, সামাজিক, দার্শনিক এবং সর্বোপরি অনেকগুলি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। সাহিস্য সমালোচনায় তিনি নতুন রীতি এবং নীতি নির্দেশ করেন,—সংস্কৃত 'রস' বাদের সংশ্লেষণী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তিনি য়ুরোপীয় 'বিশ্লেষণী' পদ্ধতির প্রচলন করেন। বাঙালীজাতির উন্নতি করতে হলে তার ইতিহাস জানা চাই, এবং তারজন্যে ইতিহাস রচনা করা উচিত, এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বেশি জোর দিয়েছিলেন এবং নিজে অনেকগুলি প্রবন্ধও লেখেন। রাজকৃষ্ণ, রামদাস, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই পথ অনুসরণ করেন।

এযাবৎ বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কবিতা প্রকাশ খুব বেশি হয়নি। সে যুগে কবি যে ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক হওয়ার ফলে কবিতা তাঁরা খুব কম প্রকাশ করতেন ('নানাকারণে 'সংবাদ প্রভাকর'কে ব্যতিক্রম ধরছি)। অবশ্য মধুসূদনের প্রথম কাব্য তিলোত্তমা সম্ভবে'র প্রথম সর্গ বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়, তাঁর বিখ্যাত আত্মবিলাপ কবিতাটি 'তত্ত্ববোধনী'তে। 'এডুকেশন গেজেট'-এ (১৮৫৬) হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ সালে যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ কবি বিহারীলালের সহায়তায় 'অবোধ বন্ধু' নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম কবিতা একটি বিশেষ মূল্য পায়। বিহারীলাল তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন', 'সুরবালা' প্রভৃতি কবিতা এবং হেমচন্দ্র তাঁর 'ইন্দ্রের সুরাপান' এই 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যদিও একসময়ে কবিতা লিখতেন এবং মধুসূদন—হেমচন্দ্রের কবিতার ভক্ত ছিলেন, তবুও 'বঙ্গদর্শনে' কবিতাপ্রকাশে তিনি কোনোদিনই বেশী উৎসাহ দেখাননি।

বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো 'কামিনী কুসুম' 'পরশমণি' 'স্বর্গারোহণ' "কমলবিলাসী' 'সুহৃৎসঙ্গম'। দীনবন্ধু মিত্রের 'প্রভাত' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। আর নবীনচন্দ্র সেনের দু-একটি রঙ্গলালের 'যুবরাজের ভারতাগমনোপলক্ষে কবিতা' ও 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রথমাংশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন তখন তাতে নতুন আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক যোগ দেন। বলাবাহুল্য পত্রিকা এবং তার লেখক গোষ্ঠীর ওপর বঙ্কিমের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র বসু, নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা লিখতেন। কবি অক্ষয় বড়ালের প্রথম কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' এই সময়েই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অক্ষয় বড়ালের কবিতা প্রসঙ্গে 'আর্যদর্শন' (১৮৭৫) পত্রিকাটির কথাও মনে পড়ে। বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সারদামঙ্গল' অসম্পূর্ণ অবস্থায় এতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'আর্যদর্শনে'ই কবি হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র সমালোচনায় (লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও যতদূর জানা গেছে নীলকণ্ঠ মজুমদার এই সমালোচনাটি লিখেছেন) একটি বিশেষত্ব দেখা যায়—

যাকে আধুনিক সমালোচনারীতির চরম একটি নিদর্শন বলে মানা যেতে পারে কারণ তাতে সমালোচক ডারইউনের থিওরী দিয়ে কাব্য বিচারের এক চেষ্টা করেছিলেন যা স্বয়ং কবি কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

এই সময়কার 'জ্ঞানাঙ্কুর' (১৮৭৩) পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'বান্ধব' (১৮৭৫) পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধ, এবং 'মালঞ্চ', 'পাক্ষিক সমালোচক' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সমালোচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সমলোচনারীতি ক্রমেই সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করে বিশেষ একটি পরিণতির পথে এগোচ্ছে, এটা বোঝা যায়।

এরপরই রবীন্দ্রযুগ। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগে থেকেই ঠাকুর বাড়িকে কেন্দ্র করে এর পূর্বভাস। ১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথেরও রচনা প্রকাশ আরম্ভ (এর আগে অবশ্য 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় তাঁর 'বনফুল' এবং সমালোচনা প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদি বেরিয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে কয়েকটি ব্রজবুলি পদরচনা করে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষের 'ভারতী'তে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' লেখার সময়ে গদ্য রচনায় কবির হাত পেকেছে। এরপর তিনি ভারতীতে অজস্র গদ্য পদ্য লিখেছেন নানা সময়ে। ১৮৯১ তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা বার করলেন। রবীন্দ্র প্রতিভা তখন মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ়; কবিতায় গানে, গল্পে, প্রবন্ধে নাটকে, প্রহসনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টির প্রাচুর্যে অজস্র ধারায় উৎসারিত হতে লাগলো। বলেন্দ্রনাথও এই সময়ে অনেক আশ্চর্য সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পত্রিকাটি কিছুদিন সম্পাদনা করেন।

১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়টা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনার যুগ বলা যেতে পারে। এইগুলি প্রধানত 'হিতবাদী'তে, 'সাধনা'য় এবং ভারতী'তে প্রকাশলাভ করেছিল। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং ১৯০৬ সালে তা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস রচনায় এখন যে পদ্ধতি চলছে অর্থাৎ সামাজিক সংস্কার নিরপেক্ষ ভাবে পাত্রপাত্রীদের মানস লোকের বিবর্তন ও বিশ্লেষণ—তার সূত্রপাত হোলো চোখের বালিতে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা' প্রকাশ হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়(১৩১৪-১৬)।

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস এবং কবিতায় একটি বিশেষ ধারা চলেছিল। 'প্রবাসী'তে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও এই পর্বে সাধু ভাষায় লেখাগদ্যের নিদর্শন। প্রথম মহাযুদ্ধ এল, আর এল 'সবুজপত্র' (১৯১৫) পত্রিকা। যার সম্পাদক হলেন প্রমথ চৌধুরী। ঘুমিয়ে পড়া মন জেগে উঠলো হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে। চলতি ভাষায় চকিত কিরণস্পর্শে গদ্য এবং পদ্যে এক নতুন রীতির জন্ম হোলো। সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ঘরেবাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ'। 'বলাকা' পর্বের অধিকাংশ কবিতাও এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদক না হলেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে। আর রবীন্দ্রনাথের সরব সমর্থন ছিল বলেই 'সবুজপত্রে'র বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যে এত সহজে গৃহীত হোলো। যে মনন এবং বুদ্ধি দীপ্ত বাচনভঙ্গী এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখতে পাই, তার ওপর নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বরাবর স্বীকারোক্তি এই যুগকে বুঝতে সহায়তা করে।

'সবুজপত্রে' এই দুজনই ছিলেন আসলে প্রধান লেখক। এমন সংখ্যাও 'সবুজপত্রে'র প্রকাশিত হয়েছে যার একমাত্র লেখক রবীন্দ্রনাথ। অন্য যাঁরা 'সবুজপত্রে' লিখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—সুরেশ চক্রবর্তী, অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

'সবুজপত্রে'র বিদ্রোহ ছিল একান্তই সাহিত্যিক বিদ্রোহ। সামাজিক বা অর্থনৈতিক মূল্য-বোধের ভিত্তিতে 'সবুজপত্রে'র লেখকেরা বিদ্রোহের কথা বলেননি কখনো। আর তাই 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের গোড়ায় বিদ্রোহের ইঙ্গিত, উপন্যাসের শেষে তা অদৃশ্য—একটা জোর করে ঘটনার গতিকে ঘুরিয়ে দিয়ে চরিত্রের অপমৃত্যু। আসলে এর কারণ ঐ মূল্য বোধজনিত পরিবর্তন তখন রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সহধর্মী লেখকদের নাড়া দেয়নি তত প্রবল ভাবে। ১৯২৩ সালে যখন দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হোলো তখন তার সঙ্গে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর কিছু সধর্মা ছিল—অন্ততঃ সাহিত্যিক বিদ্রোহ, (ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ইত্যাদি) দুদলেরই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু 'কল্লোল'-এর লক্ষ্য ছিল আরও কিছু বেশি। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায়, কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থাবর সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কিছু লেখকদের মনে হোলো যে তৎকালীন প্রধান সাহিত্যিকদের কবিতা সমতল সদৃশ অনুভূতিহীন, উপন্যাস-গল্পে বাস্তব-ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন; মনে হোলো সেই সাহিত্যিকেরা তাঁদের জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তাঁরা অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিল সন্দেহ নেই, আবিলতাও ছিল, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিল তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে।

কোনো মানুষই অমর নয়। কোনো সাময়িক পত্রই চিরজীবী নয়। বিশেষ করে বাংলা-দেশের সাময়িক পত্রগুলি একটু বেশীই ক্ষীণজীবী। এর কারণ নানা ধরণের। বিক্রয়ের স্থিরতা নেই, গ্রাহকের নির্দিষ্টতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ যখন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তখন এই অনিশ্চয়তা ছিলনা—কিন্তু প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পক্ষে সাংবাদিকতা নিয়ে সারাজীবন কাটানো অসম্ভব, তাই তাঁরা চার বছর (বঙ্গদর্শন) বা একবছর (সাধনা) পত্রিকা চালিয়েছেন, তারপর সম্পাদনী ভার ত্যাগ করেছে। অথচ বাঙালী পাঠক কখনোই একটি বিশেষ পত্রিকার প্রতি বেশীদিন আগ্রহী থাকে না, রবীন্দ্রনাথ যখন 'প্রবাসী'তে লিখতেন তখন 'প্রবাসী'র গ্রাহক বেড়েছিল, যখন তিনি 'বিচিত্রায় লেখা আরম্ভ করলেন তখন 'বিচিত্রা'র বিক্রী বাড়লো। এই সব পত্রিকার সম্পাদকদেরও সাধারণতঃ সেই প্রতিভা বা ব্যক্তিত্ব নেই যার ফলে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন। লেখকেরা আজ এই কাগজে লিখছেন, কাল বেশী টাকা পেলে অন্য কাগজে লিখবেন। গ্রাহক এবং বিক্রেতাও এই ভাবে কমবে বাড়বে। কিছু এতে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সাময়িক পত্রের মৃত্যু আছে—সাহিত্যিকের মৃত্যু আছে, কিন্তু সাহিত্যের মৃত্যু নেই। সাহিত্য অমর, সাহিত্য চিরজীবী। আর তাই সাহিত্যরচনা চলবে যতদিন ততদিন তা প্রকাশ করবার জন্য সাময়িক পত্রেরও অভাব হবে না। এই ভাবে সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের মধ্যে যোগ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

গণিতের দর্পণে ঃ গ্রীস

মুরারি ঘোষ

একদা প্লেটো বলেছিলেন গ্রীকেরা যা গ্রহণ করে, উন্নত ও সম্পূর্ণ রূপায়নে তার পরিণতি ঘটে, গ্রীকমানসে এ মৌলিকত্বের দাবী ঐতিহাসিক সত্য। গ্রীসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান জগতের সমস্ত জ্ঞানসম্পদ পশ্চিম থেকে আহরণ করা। গ্রীক সংস্কৃতির প্রারম্ভিক কেন্দ্রবিন্দু যদি আলেস হন তাহলে গ্রীক বিজ্ঞানের দূরকল্পী মৌল সম্পদ গ্রীসের অশেষ ঋণ মিশর ও ব্যাবীলনের কাছে। আলেস, পীথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস, প্লেটো আরিস্টটল এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যাশ্চর্য ভ্রমণকারী। পশ্চিমের জ্ঞানসম্পদ সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে গ্রীক চিন্তার ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে এঁদের কালযাপন। এই আহৃত জ্ঞান-সম্ভার জাতীয়করণে গ্রীক মৌলিকত্ব পৃথিবীর অশেষ উপকার করেছে। বিজ্ঞান বা গণিতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষরে অভূতপূর্ব আকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সামগ্রিক চিন্তাধারায়, কৃষ্টি সাধনার কাঠামো নির্মাণে, জ্ঞানচর্চার প্রকরণগত উৎকর্ষে, প্রাচীন পৃথিবীর ঐতিহ্যে ও বর্তমান জগতের বাস্তবতায় যতখানি ফারাক তার বেশ কিছু ভগ্নাংশ গ্রীক-প্রতিভার দান।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তিবাদের জন্ম। বুদ্ধির স্বাক্ষরে সুযুক্তি প্রয়োগে বস্তুগত অভিজ্ঞতার যে বিমূর্তন তার প্রথম সূত্রপাত গণিত চর্চায়। অবশ্য এও সত্য যে জ্ঞানের চরম বিমূর্তনে যা বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাও গণিতের দান। বিমূর্তজ্ঞান প্রতি ধরণের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করতে পারে। এ চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর প্রাচীন ভারতের প্রতিটি অভিজ্ঞতায়, শাস্ত্রে, জ্ঞানসম্পদের মূলকথা হয়ে আছে। সেখানে বিমূর্তনের চরম রূপলাভ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য বলে কথিত। মূর্তরূপ থেকে অভিজ্ঞতার এই যে বিমূর্ত রূপসন্ধানে যাত্রা গ্রীসে তার আরম্ভ ঘটে সরল যুক্তিপ্রয়োগের অনুশীলনে। গণিত চর্চায় এই সুযোগ গ্রীকমানস অত্যাশ্চর্য ভাবেই গ্রহণ করেছে। গ্রীক প্রতিভার মৌলিকত্ব হোল সুযুক্তি প্রয়োগের উৎস থেকে যাত্রা করে যুক্তিবিজ্ঞানের পরিণত ঐতিহ্যে যাত্রাশেষ করা।

গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের সমস্তরকম কলাকৌশল বিশেষ ধরণের যুক্তিজাল রচনায় সিদ্ধ। যুক্তিবিজ্ঞানের অবরোহ প্রণালীর বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের অফুরন্ত উৎস হোল গণিত। গাণিতিক প্রতিজ্ঞা থেকে গাণিতিক সিদ্ধান্তের ধ্রুবতা যুক্তির অবরোহে সংবদ্ধ। আবার যুক্তিবাদের বুদ্ধি-প্রাধান্যে অখণ্ড চেতনার যে বিমূর্তন তাও যুক্তিবাদের শিলভূত অংগীকারে আবদ্ধ। সেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির বিস্তারে, চিন্তার অবরোহে, ভূয়োদর্শিতার বৈচিত্র্যে গণিতের প্রেরণা অসম্ভব কার্যকরী। গণিতের প্রেরণায় সুচিন্তার যুক্তিপ্রয়োগে গ্রীসের অশেষ কৃতিত্ব।

মিশরের ভূয়োদর্শন গ্রীকবিজ্ঞানের জনক। মিশরের মৃতদেহ সংরক্ষণ শত শত বৎসরের ঐতিহ্য অনুসারী। তবু মৃতদেহ চর্চায় তাদের অভিজ্ঞতা সামান্য শারীর বিদ্যা বিকাশেও সহায়ক হয়নি। শারীর চর্চায় বিমূর্তরূপ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় গ্রীক-শিল্পে প্রযুক্ত। মিশরের গণিত আলেস, পীথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন। মিশরের চিন্তায় প্রায় তিন-হাজার বছর ধরে যা ভূয়োদর্শন ছিল—জ্যোতির্বিদ্যা সংখ্যাবিজ্ঞান, জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত তার সবকিছুই আলেস-পীথাগোরাসের মননশীলতায় অনবদ্য বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছিল। আলেস সুরু হয়েছিল গ্রীকবিজ্ঞান এবং হয়তো গ্রীকবিদ্যায় সুযুক্তি প্রয়োগের সুযোগও। যুক্তি প্রয়োগের

অপূর্ব পদ্ধতি, গ্রীকবিজ্ঞান, দর্শন এমন কি সাহিত্য ও শিল্পের আংগিক ও প্রকরণ গত সৌকর্যের ধাত্রী। কয়েক সহস্র বছর ধরে মিশরে যা কেবল রুটিন চর্চা ছিল, গ্রীকমানসের পরিশীলিত চর্চায় মাত্র কয়েক শতকের ব্যবধানে তা পত্রে পুষ্পে শোভিত এক পরিণত জীবন-সাধনায় পর্যবসিত হয়েছে। গ্রীক গণিতের সর্বাংগীণ উন্নতি, নিকোমাকাসের পাটীগণিত, ডায়োফাণ্টাসের বীজগণিত এবং সমগ্র গ্রীক-মনীষার কয়েক শতাব্দী সঞ্চিত সাধনার পরিণতি ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং টলেমী বা আরিস্টারকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান মিশরীয় গণিতের ভূয়োদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। মিশরে যাদের জন্ম ও পরিশেষে লালন পালনের সম্ভবনা ছিল—কেবল সুযুক্তি প্রয়োগের বা মুক্তবুদ্ধি পরিশীলিত চিন্তার বিশেষ অভাবে সে সম্ভাবনার অতল সমাধি ঘটেছিল। মরিস ক্লাইন বলেছিলেন: "প্রায় চারহাজার বছর ধরে মিশরীয় সভ্যতা এক ঐতিহ্য রক্ষা করে এসেছিল। ধর্মে, দর্শনে, বাণিজ্যে, কৃষিকর্মে, এমনি কি গণিতানুশীলনে প্রতিটি মিশরীয় তার পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করে এসেছে।" এখানে কি কর্মে কি চিন্তায় সামান্য পরিবর্তনের স্বপ্নও সমাধিস্থ।"

গণিত যদি সৃষ্টিশীল কর্মের অংগীভূত হয়, তাহলে গণিতের আকর্ষণ কি? কোন্ প্রাথমিক প্রেরণায় মানুষের মননশীলতা গণিত চর্চায় মগ্ন হয়? সমস্ত জ্ঞানানুশীলনের আদিমতম সেই উত্তর গণিতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দৈনন্দিন জীবন চর্চার বাস্তব অনুপ্রেরণাতেই অন্যসমস্ত অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রের সংগে গণিতেরও জন্ম। গণিতের প্রসংগ সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতায় গভীর হলেও লৌকিক প্রয়োজনের তাগিদে তার অগভীর জন্মসম্ভাবনা বাস্তবসত্য। মানুষের দৈনিক জীবনচর্চার অজস্র কৃতকর্মের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হোল গণিত। যেমন, ব্যবসাবাণিজ্যগত আদানপ্রদানে, নৌবিদ্যায়, পঞ্জিকা রচনায়, স্থাপত্যশিল্পের অজস্র গঠনকর্মে, সেতুবন্ধনে, গৃহ-পথ-বাধ নির্মাণে এবং মানুষের শতশত প্রয়োজনীয় কর্মের সিদ্ধিলাভে গণিতের প্রযুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

আদিম পৃথিবীর ভূয়োদর্শী গণিতের কয়েক শতাব্দীব্যাপী সাধনার পরিণতি যে যুক্তি-ও বুদ্ধিবাদ তা অধুনা সমস্ত শাস্ত্র চর্চারই কেন্দ্রবিন্দু। গাণিতিক প্রত্যয় পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত বস্তুবিজ্ঞানের গহনস্তরের মৌলরূপ-নির্মাতারই এমন কি বস্তুবিজ্ঞানের সামগ্রিক সাফল্য গাণিতিক সম্পর্কনির্ভর। গণিতজ্ঞ ক্লাইন পরিষ্কার বলেছেন: "এই সমস্ত শাস্ত্র চর্চার সাফল্য নির্ভর করছে সেই সম্পর্কের ওপর যেখানে তারা গণিতের সংগে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা এদের বিচ্ছিন্ন তথ্যের শুকনো অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে গণিত এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করে তাদের বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছে।"

শুধু তাই নয়, সদ্‌যুক্তি নির্মাণের সক্রিয়তা গণিতেরই একক বিশেষত্ব এবং সমগ্র বস্তুবিজ্ঞানের যুক্তি গ্রাহ্য কাঠামো নির্মাণেই গাণিতিক যুক্তির শেষ কথা এমন উক্তি করাও চলে না। কেননা দর্শনও সদ্‌যুক্তির ভাগীদার। সদ্‌যুক্তি ব্যতীত দর্শনের আবির্ভাব ঘটে না। একথা প্রথম নাকি প্লেটোই বলেছিলেন। অবশ্য প্লেটোর অনেক আগেই দর্শনের বাস্তবক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগের মনোরম ঐতিহ্য গ্রীসদেশে গড়ে উঠেছিল। দর্শনই হোক বা বিজ্ঞানই হোক গ্রীক দূরকল্পনার জনক হলেন আলেস। আলেস গণিত চর্চায় সুযুক্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। সে যুক্তির কাঠামে গ্রীক দর্শনের আর্বিভাব হোল আলেসের হাতেই। তা ছাড়া জগৎ তৈরী হতে পারে না এমন একটি উপাদান খোঁজার চিন্তায় আলেস মগ্ন। গ্রীক পুরাণের যুক্তিহীন ঐতিহ্যে আলেসের মন ভরে না। পৌরাণিক উপাদানের অস্তিত্বে আলেস বিশ্বস্ত নন। বিশ্বজগৎ গঠনের এমন আদিমতম উপাদানের উল্লেখ মিশরের পুরাণেও পাওয়া যাবে। ব্যাবীলনীয়

বিদ্যায়ও এর উত্তর মেলে—কিন্তু আসল যুক্তিবাদেরই পরাজয় সেখানে। সুযুক্তির সন্দেহ প্রকাশেই গ্রীসে দর্শনের জন্ম হোল। আলেসের গাণিতিক মন হোল তার স্রষ্টা।

আলেস যে বীজ উপ্ত করে গেলেন তা থেকে সৃষ্টি হোল মনোরম উদ্যানের। আলেসের ঐতিহ্য পথ অনুসরণ করে এলেন আনেক্সামান্ডার আনেক্সিমিনস্। দার্শনিক যুক্তিপ্রয়োগের উপর পথ নির্মাণে আলেসের প্রভাব তাঁদের বিশেষরূপে সক্রিয়।

আর গণিত নিয়ে, এমনকি গণিতের উপাদানেই দার্শনিক চিন্তাধারার মূর্তিনির্মাণ করলেন পাঁথাগোরাস। পাঁথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্ব অবশ্য আদিম সংখ্যাচেতনার রহস্যময় রূপের দার্শনিক ব্যাখ্যাপ্রচেষ্টা। তবু গণিত নিয়ে গণিতের নির্বিশেষ রূপের কাঠামোয় দর্শন চিন্তা পাঁথাগোরাসের জ্ঞান জগতের একমাত্র উপাদান কেননা ভূয়োদর্শন বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানরাজ্যে একান্ত অবাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, আলেসের ঐতিহ্যে এতদিন দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন সত্তা ছিলনা—ছিল তাদের যুক্ত অস্তিত্ব। পাঁথাগোরীয় গণিত চর্চাই দর্শন ও বিজ্ঞানকে দুই বিভিন্ন রাজ্যসীমায় প্রতিষ্ঠা দিল। তবু গণিতের বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়েও দর্শনের স্বাধীন বিকাশে গণিতের প্রভাব রয়ে গেল। গণিতের অগ্রগতিতে দার্শনিক চেতনায়ও রসসঞ্চার হয়। ইতিহাসে এমন উদাহরণও যথেষ্ট যে দার্শনিক চেতনার অনড় ঐতিহ্য ও যুক্তিহীন বিশ্বাস গণিতের প্রগতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—কিন্তু গণিতের অগ্রগতি দর্শনের পথরোধ করে কখনও দাঁড়ায় নি।

গ্রীকদর্শনের ক্রমবিকাশের ঐতিহাস অনুসরণে তার প্রগতির প্রতিটি অধ্যায় কিংবা প্রতিটি দর্শন অধিবেত্তার সৃষ্টি বৈচিত্রের অংশীদাররূপে সুযুক্তি প্রয়োগক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। আলেসের পরবর্তী এক বিস্তৃত নাম-তালিকা আর দর্শনের নিরস ইতিহাস বর্ণনায় দর্শনে যুক্তি প্রাধান্যের সম্পন্ন ঐতিহ্য বিবৃত করতে পারা যায়। তাতে নিবন্ধ দীর্ঘতর হবে তবু একজনের দর্শন চিন্তার যুক্তিবাদ এখানে আলোচনা না করলেই নয়। তিনি হলেন হেরাক্লিটাস। জগৎ সংসারের মৌলপ্রবাহের নিয়ামক রূপে তিনি যাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাকে বলেছেন নিয়তি এবং অপর নামে তাকে অভিহিত করেছেন: বিশুদ্ধ যুক্তি। বিশুদ্ধ যুক্তিকে নিয়তি আখ্যা দিলেন হেরাক্লিটাস—এবং বিশুদ্ধ যুক্তির সর্বোচ্চ আসনলাভে প্রথম সহায়ক হলেন তিনি। হেরাক্লিটাসের গতিবাদে বিবৃত: পরিবর্তমান পৃথিবীর মূলে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা—সংঘর্ষের অন্তরে রয়েছে সংগতির অনুশাসন। পরিবর্তনের অস্থির নীতি যুক্তি-গ্রাহ্য শৃঙ্খলায় আবদ্ধ—যুক্তির এই অনুশাসন কে তিনি ঈশ্বর রূপে অভিহিত করতেও কুণ্ঠিত নন।

ইতিমধ্যে গ্রীক গণিতে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে—গাণিতিক ঐতিহ্য ক্রমশ ভারী হয়ে চলেছে। অন্য সমস্ত সৃষ্টিশীল চিন্তায় তার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ প্রয়োগ-সম্ভবনা গভীরতর সম্পর্ক বন্ধনের অপেক্ষায়। এমনসময়ে গ্রীকদর্শনের এক আশ্চর্য দিক পরিবর্তন। দর্শনের ইতিহাসে যাদের সফিস্ট বলা হয় তাদের আবির্ভাব হোল, খৃ.পূ. ষষ্ঠ শতকে। এথেন্সের প্রভাব প্রতিপত্তির সুরু এই শতকেই। এই শতকেই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোল গ্রীসের সৃষ্টিশীল মন। গণিতজ্ঞ স্ট্রুইকের ভাষায়: "এক নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে গ্রীক শিক্ষাগুরু ও দার্শনিকেরা নতুন তত্ত্বচিন্তার সংগে নতুন গণিতের আমদানী করলেন। ইতিহাসে এই প্রথম "সফিস্ট" আখ্যাধারী, ঐতিহ্য-উদাসীন একদল সূক্ষ্মবিচারশীল মানুষ গাণিতিক তথ্যের নিছক উপযোগ বাদীদিয়ে গণিতের বুদ্ধিবাদ-চর্চায় রত হলেন।"

এ যুগে গণিতের বস্তু গ্রাহ্য-অভিব্যক্তি গভীরতর বিমূর্তরূপে আশ্রিত হোল। গণিতজ্ঞ

হিপোক্রেটসের আবির্ভাব আর প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত গণিতের উদ্ভাবনাহোল এই যুগেই জ্যামিতির তত্ত্বগত চিন্তায় পরিবর্তন এল। জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত অভিমুখে পৌঁছোবার আগে কতকগুলি ধ্রুব স্বীকার্যের তত্ত্ব বিধিবদ্ধ করে নিল। গাণিতিক স্বীকার্যের প্রাথমিক অনুশাসনে নতুন চলার পথ গড়ে উঠলো। গাণিতিক স্বীকার্যের ভিত্তিভূমিতে গণিতের এই যুক্তিস্থাপনা দর্শন জগতের বিপ্লব সূচনা করে। সেখানেও দার্শনিক যুক্তিসৌধের ভিত্তি-নির্মাণ কতকগুলি পূর্বস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের ওপরেই। সফিস্টদের নতুন দর্শনের প্রাথমিক স্বীকার্য হোলঃ জগতের সকল পদার্থের মানদণ্ড মানুষ। মানুষ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই নির্ধারণ করবে এই দুনিয়া সবকিছুরই মূল্য। বিচার করবে বিভিন্ন মতের সত্যতা কি অসত্যতা। কিন্তু সফিস্টদের কাছে মানুষের এই ধারণা সম্মিলিত মানুষের নয়। ব্যক্তি মানুষের বিশিষ্টতা তাঁদের দর্শনে সর্বোচ্চ স্থান পেল। এখানেই হোল সফিস্টদের পরাজয়। অবশ্য তৎকালীন গ্রীক সমাজনীতির বিমূর্ত প্রতিফলন সফিস্টদের চিন্তাধারায় প্রকাশ পেয়েছিল। গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব পটভূমিকায় সফিস্টদের চিন্তাধারা বিচার্য। সফিস্টদের চিন্তায় মূল্য-নির্ধারক মানুষ মাত্রেই ব্যক্তি বৈচিত্রে ও চরিত্রে প্রোজ্জ্বল। আজকের গণতন্ত্রের যুগে যে মূল্যায়নে ব্যক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত তার প্রাথমিক স্বীকার্যই কিন্তু সফিস্টদের চিন্তায় অনুপস্থিত। এথেনীয় সাধারণতন্ত্রের দর্শন প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবাদের নিছক ভারবহী হোল এই দর্শন চিন্তা। জন বার্নেটের মতেঃ সফিস্টদের তত্ত্বচিন্তা পরিষ্কার বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, এদের জীবিকার্জন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল সেই সব মানুষদের ওপর যারা গ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অভিজাত তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।" (জন বার্ণেটঃ গ্রীক ফিলোসফি)

গ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভিজাত তন্ত্রের প্রথম মন্ত্রগুরু বলাচলে সফিস্টদের। গণিতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সফিস্টদের ছিলনা। কোন গ্রীক চিন্তার যুক্তি বৈচিত্রে সফিস্টদের প্রত্যয়-বোধ উল্লেখযোগ্য। সফিস্টদের সমসাময়িক ছিলেন ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাস বস্তুবাদী দর্শনের বিস্তারিত সূচনা করেন গ্রীসে। ডিমোক্রিটাসের চিন্তার মূলে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশ্য ডিমোক্রিটাসের প্রত্যয় মিশ্র বা ব্যাবিলনীয় জগতের স্থূল বস্তু অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট পরিমার্জিত। এক পরিণত গণিত-ঐতিহ্যের ও সুযুক্তি প্রয়োগের উত্তরাধিকারীত্ব ডিমোক্রিটাস সযত্নে লালন করেন। পদার্থের পারমাণবিক গঠন-সৌকর্যের দার্শনিক প্রত্যয়ের সংগঠক তিনি। লিউসিপাসের দর্শন থেকেই পদার্থের এই নতুন প্রত্যয়-বোধ তিনি লাভ করেন। শুধু তাই নয়,দার্শনিক নিয়তিবাদের প্রাথমিক যুক্তি লিউসিপাসই চিন্তাজগতে আমদানী করেন। "কার্যকারণ সম্পর্কে নিশ্চিত বাঁধনে গ্রথিত বস্তুজগতের তাবৎ সত্য"—এই পর্যায়ের উক্তিও লিউসিপাসের কাছ হতে প্রথম পাওয়া যায়। ডিমোক্রিটাস কিন্তু লিউসিপাস বর্ণিত প্রত্যয়বোধের পুঁথিগত অভিজ্ঞতায় তৃপ্ত ছিলেন না। দেশ বিদেশের জ্ঞানরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। কথিত আছে তিনি নাকি ভারতবর্ষেও ভ্রমণ করেছিলেন। বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিশাল আকাশপটে তিনি লিউসিপাস প্রবর্তিত দর্শন চিন্তার পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধিজাত ও মাত্র যুক্তিসম্বল জ্যাগতিক ধারণার প্রথম উদ্ভাবক হলেন পারমেনাইডেস। পারমেনাইডেস বর্ণিত বিশুদ্ধ চিন্তার ঐশ্বরিকতায় ডিমোক্রিটাসের আস্থা ছিল না। পারমেনাইডেস বস্তুগত চেতনাকে সরাসরি নির্বাসন দিয়েছিলেন। পারমেনাইডেসের বস্তুহীন নিশ্চল স্থিতিবাদ আর হেরাক্লিটাসের প্রবহমান জগতের গতিবাদ দুয়েরি নিয়ামক হোল বিশুদ্ধ যুক্তি। এই দুই আপাতবিরোধী চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাসের জগৎ অসংখ্য পরমাণু ও অসংখ্য শূন্য দিয়ে গঠিত। ভূয়োদর্শন জাত অথচ অপরীক্ষিত,

অভিজ্ঞতালব্ধ, সার্থকতম দর্শনচিন্তার নায়ক হলেন ডিমোক্রিটাস। ফ্যারিংটনের মতে বস্তু-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রথম উপকরণ সরবরাহ করলেন ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর দর্শন চিন্তা প্রথম থেকে স্বতঃসিদ্ধ আকারে গ্রথিত—অবশ্যই তাঁর চিন্তার পরীক্ষা-সিদ্ধ যে রূপ তা আবিষ্কার করা তখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আর জাগতিক এই বস্তুরূপের বিশ্লেষণ কেবল বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা সম্ভব নয়, বহির্জগতের চেতনার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। চিন্তার এই নির্বিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করেন নি বলেই প্লেটোর কাছে ডিমোক্রিটাস ছিলেন অসহ্য। বিশাল যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হলেও গ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধে ওঠা প্লেটোর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ডিমোক্রিটাস যেখানে সাধারণ বুদ্ধি (Common Sense) আর অনায়াস যুক্তি দিয়ে যে দার্শনিক জগতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্লেটো সেখানে সহজবুদ্ধির ধার দিয়েও গেলেন না। তাঁর যুক্তির বিশুদ্ধ রাজ্যে বিজ্ঞানের বস্তুগত অস্তিত্বও স্বীকৃত নয়। ডিমোক্রিটাস বস্তুজগতকে দুভাগে ভাগ করেছিলেনঃ বস্তু ও মন। ডিমোক্রিটাসের এই বিভাগ মূলগতভাবে যান্ত্রিক যুক্তি-বাদের অন্তর্গত হোলেও তা আমাদের সহজবুদ্ধি-প্রধান যুক্তির অনুগামী। কি রাজনৈতিক দর্শনে বা মানুষের দৈহিক গঠনের দার্শনিক ব্যাখ্যায় পূর্ব কল্পিত নিশ্চিত ধারণা নিয়ে প্লেটো দর্শন চিন্তায় অগ্রসর হয়েছিলেন। প্লেটোর দার্শনিক সতঃসিদ্ধ গুলির অবাস্তবতা আজ কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহলই চরিতার্থ করে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে অভিজাত তন্ত্রের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র প্রাধান্যের স্বীকৃতি কিংবা মানবদেহে মস্তক স্থাপনের অদ্ভূদ দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ-যোগ্য।* মস্তকের প্রাধান্য রচনায় প্লেটোকে অস্বীকার করতে হয়েছে বস্তুজগত এবং বস্তু-বিজ্ঞানকেও। অবশ্য সক্রেটিসের ভাববাদী চিন্তার প্রসারিত রূপদান করেছেন প্লেটো। সক্রেটিস বস্তুবিজ্ঞানকে মারাত্মক বিষের মত পরিত্যাজ্য মনে করতেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধিজাত যুক্তির আধিক্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভারাক্রান্ত। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা-নির্ভর ভিত্তি তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর বুদ্ধিবিলাসে গাণিতিক প্রত্যয়, নীতিবাদ, ধর্মতত্ত্ব, বস্তুচেতনার সম্পূর্ণ আওতার বাইরে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞা মাত্র। বিশেষ করে গণিতের প্রসঙ্গে তিনি প্রখর যুক্তির অবতারণা করেছিলেন।

চিরন্তন গণিতের প্রত্যয়ে তিনি মানবাত্মার মৃত্যুহীন সংগীত আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি মনে করেন গণিতের সমগ্র উপকরণ বস্তুচেতনাজাত নয়। কেননা বহির্বিশ্বে সম্পূর্ণ বৃত্ত বা সম্পূর্ণ ত্রিভুজ বলে কোন বস্তু-সত্তা থাকতে পারে না। গাণিতিক প্রত্যয়গুলি বিকৃত অভিজ্ঞতার আদর্শ রূপ মাত্র এবং সম্পূর্ণ বস্তু-চেতনা নিরপেক্ষ জ্ঞান। তাঁর মতে, গণিতের বস্তু-সম্পর্ক-হীনতা দিয়েই আমরা অন্যান্য প্রত্যয়গুলি বিচার করি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, কোনো গোলা-কৃতি পুকুরের আকার দিয়ে আমরা জ্যামিতিক বৃত্তের সংজ্ঞার্থ নিশ্চই বিচার করবো না। বরংচ জ্যামিতিক সংজ্ঞার সঠিক অর্থদিয়ে পুকুরের গোলাকৃতি বিচার করবো। এখানে বস্তুবিচারের মাপকাঠি হোল বিশুদ্ধ ধারণাজাত প্রত্যয়। সক্রেটিসের মতে গণিতের সত্য চিরন্তন, অপরি-বর্তনীয় ও চরম। অতএব গণিতের জ্ঞান আমরা সংগ্রহ করি অন্য এক জগৎ হতে। যেখানে অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে আমাদের মন তার বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সেই অভিজ্ঞতার আদর্শ উপ-করণে আমাদের এই অসম্পূর্ণ জগৎ গঠিত। বিশুদ্ধ ধারণার বিচারে আমাদের বস্তুজগত এতটা অসার্থক ও বিকৃত।' ফ্যারিংটনের মতে সক্রেটিসের গাণিতিক তত্ত্বের এই অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা তাঁর

* প্লেটোর Timaens এ বর্ণিত আছে যে মাথার গোলাকৃতি বস্তুভারের সমতা রাখার জন্যেই মাথার সঙ্গে দেহ আর দুই হাত ও দুই পায়ের সংযোজনা।

নীতিবাদেও সম্প্রসারিত হয়েছে। ফ্যারিংটন আরো বলেছেন; "বিশুদ্ধ গণিতে যে স্বচ্ছতা বা অদ্বৈতবোধের প্রসার তা তিনি নৈতিক প্রত্যয়বাদে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা-ছিল, গণিতের অপরিবর্তনীয় সত্যের ধারণা প্রতি মানুষের গহন মনে সুপ্ত থাকে। গণিতের শিক্ষায় বাইরে থেকে কোন জ্ঞান আহরিত হয় না। আসলে সুপ্ত চিত্তের জাগরণ ঘটে।" অতএব তাঁর ধারণায় আদর্শগুণ বা ধর্ম প্রত্যেক মানুষে সহজাত।" (সায়েন্স ইন এ্যান্টীকাটি ঃ ফ্যারিংটন) সক্রেটিসের মতে গণিত চিন্তায় যে মনন সক্রিয়, নীতি আচরণের যুক্তিসিদ্ধ ধারণায় সেই মননকেই তার গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কেননা গণিতের যে চরম সত্য সেই সত্যই প্রসারিত হয়ে আছে চরম সৌন্দর্য চেতনায়, বা সার্থক ন্যায়বিচারেও। প্রকৃতির জগতে এদের কারুরি সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সম্ভব নয়।*

গাণিতিক চিন্তার এই সর্বব্যাপী মননে লালিত হয়েছিলেন প্লেটো, এবং সক্রেটিসের মূল দার্শনিক প্রজ্ঞার সমগ্ররূপের অনুধাবণ একমাত্র প্লেটোর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সক্রেটিসের দর্শনে গণিত চিন্তার প্রাধান্য থাকলেও আসলে সক্রেটিস মোটেই গণিতজ্ঞ ছিলেন না। সক্রেটিসের মধ্যে যা প্রধান তা হোল গ্রীক যুক্তিবাদের স্বচ্ছ উত্তরাধিকার আর গণিতের সামগ্রিক বুদ্ধিবাদে গভীর আস্থা। সক্রেটিসের ডায়েলেকটিক পদ্ধতিতে তর্ক প্রয়োগের নমুনা গাণিতিক যুক্তির অবরোহে স্বচ্ছন্দ অনুগামী। তাই সক্রেটিস শিষ্য প্লেটো এমন কথাও বলতে পেরে-ছিলেন যে গণিত চর্চাকে অবশ্য-শিক্ষণীয় শাস্ত্ররূপে আইন বেঁধে দিতে হবে। যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন গণিত তাদের কাছে কেবল যেন চিন্তাবিলাসে পরিণত না হয়। গণিতের শিক্ষায় বিমূর্ত মননে ঊর্ধগামীমন অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাবে। বিশেষ করে জ্যামিতির যুক্তিনিষ্ঠায় প্লেটোর অপরিসীম মমতা। এমন কি প্লেটোর ঈশ্বরও নিয়ত জ্যামিতি চর্চায় রত।*

গণিতের প্রচ্ছদে ভূষিত করে প্লেটো তাঁর সমগ্র দর্শন চিন্তা উপস্থিত করেছিলেন। তবু প্লেটো কোনোকালেই মহৎ গণিতজ্ঞ বলে স্বীকৃতি পাবেন না। সমসাময়িক গণিতের সকল তত্ত্ব অবশ্যই প্লেটোর অনুধাবন যোগ্য ছিল—আর সমসাময়িক গণিত-চিন্তাকে প্লেটো তাঁর দার্শনিক অভিজ্ঞায় সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছিলেন। ইউক্লিডের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রীকো-ঐতিহাসিক প্রোক্লাস প্লেটোর এই প্রভাব বিস্তারের কাহিনী তুলে ধরেছিলেন ঃ "গণিতে বিশেষ আগ্রহ থাকায় প্লেটো সমগ্র গণিত এবং বিশেষ করে জ্যামিতির সম্প্রসারণে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছিলেন। গণিত-তথ্যের নানান চিত্রে তাঁর চিন্তাজগৎ উজ্জ্বলকরে তিনি সমগ্র দর্শন-প্রিয় মানুষের গণিতের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন"। (এ-হিস্ট্রী অব সায়েন্স ঃ জর্জ সার্টন।)

গণিতের প্রতি প্লেটোর অস্বাভাবিক মমতার প্রধান কারণ হোল, প্লেটোর মূল প্রত্যয়-বোধ গণিত চিন্তায় যতখানি সম্পূর্ণতা বা আদর্শরূপ ধারণ করতে পেরেছে, দর্শনের অন্য কোনো বিভাগে তা পারে নি। সক্রেটিস তাঁর গণিত চিন্তা নীতিবাদের ধ্রুব আদর্শ সন্ধানে নিয়োগ করে-ছিলেন। তেমনি প্লেটোর সমগ্র চিন্তার রাজ্য গাণিতিক প্রত্যয়বোধের আদর্শ সামনে রেখে জাগ-তিক পরিবেশের বিচার করেছে। যেমন, আদর্শ বৃত্ত বললে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আমরা হৃদয়-ঙ্গম করতে পারি, কেননা জ্যামিতিক অংকনে আদর্শ বৃত্তের চিত্র রচনা সম্ভব। কিন্তু আদর্শ ঘোড়া বললে আমরা কিছুই বুঝবো না। পার্থিব কোন জিনিষের উদাহরণে বহির্জগতের কোন বস্তুর আদর্শরূপ পাওয়া সম্ভব নয়। আদর্শরূপের কোনদিন পরিবর্তন ঘটে না। শাশ্বত তার

* Perfect justice, perfect truth, perfect beauty like perfect circles do not exist in nature : Farrington.

* God ever geometrizes : Plato.

অভিব্যক্ত রূপ। কিন্তু পার্থিব প্রতিটি পদার্থই নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু-সত্তা মূলতই অনিত্য। অথচ গণিতে অনিত্য ধারণা বলে কিছুই নেই। সেখানে গাণিতিক প্রতিপাদ্য ধ্রুব সিদ্ধান্তে অনুগামী। সক্রেটিস যে সামান্য প্রত্যয়ের পরিকল্পনা দিয়ে গিয়েছিলেন প্লেটোর এই প্রত্যয়বাদ তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকেই উদ্ভূত।

প্লেটোর গণিত-চিন্তায় সবচেয়ে মারাত্মক দৈন্য হোল, গণিতের বস্তু-গ্রাহ্য প্রয়োজনীয়তায় অস্বীকার। গণিতের ধ্রুব আদর্শ দার্শনিক মানুষের মানসিক খোরাক হতে পারে—শাশ্বত সত্যের প্রতীকও হতে পরে কিন্তু বহির্জগতিক ঘটনার পরিমাণ বিচার একমাত্র গণিতের দ্বারাই সম্ভব। আসলে গণিতের উদ্ভাবনার ইতিহাস শাশ্বত সত্য সন্ধানের তাগিদে নয় বরংচ বস্তুসত্তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিমাণ বিচারে। মূলত প্লেটোর প্রভাবে এই অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ থেকে গ্রীক গণিত বিচ্যুত হয়েছিল। মরিস ক্লাইন বলেছেন ঃ "এর ফলেই সূত্রধরের যন্ত্র থেকে, চাষীর গৃহ থেকে, জরীপকর্তার ঝুলি থেকে গণিত উধাও হোল—আর নিশ্চিন্ত মানুষের চিন্তায় ঠাঁই নিল।" (ম্যাথামেটিক্স ইন ওয়েস্টার্ণ কালচার ঃ মরিস ক্লাইন।) ফলে গ্রীক গণিত দর্শনকে যতটা উন্নত করেছে,—প্রথর যুক্তিবাদে উজ্জ্বল করেছে—স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্যে নিজে ততটা প্রয়োজনীয় হয়নি। গ্রীক গণিত গ্রীক শিল্পের অতুলনীয় রূপচর্চার প্রেরণা যুগিয়েছে—স্বাভাবিক সৌন্দর্য-বোধের ধ্রুব আদর্শ সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু বস্তু চেতনা গভীর করে নি। উপরন্তু গণিতেরই বস্তুভার মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। গণিতের তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে তার যে পূর্ণতা প্রাপ্তি আদিগণিতের দু দেশের দুই বিশিষ্ট বিকাশে তাদের বিচ্ছিন্ন প্রসার দেখতে পাই। মিশরে তথ্যের সম্ভার—গ্রীক গণিতে তত্ত্বের প্রকাশ। মিশরে দর্শন চিন্তা উদ্ভব হয়নি—অঙ্কচিন্তাই চমৎকার। গ্রীসে অঙ্কচিন্তা বর্বরতার লক্ষণ—দর্শনের বিমূর্ত জ্ঞানই কাম্য। এমন কি কোন নাগ-রিক যদি সংগৃহীত জ্ঞান ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করে তবে তার শাস্তিবিধানও প্লেটো নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু দর্শনের বিমূর্তনে নয়, বিজ্ঞানের বস্তুতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছিল গ্রীসে। এমন কি আর্কিমিডিসের মত বৃহৎ প্রতিভাও গ্রীক গণিত ও বিজ্ঞানের রুদ্ধ বিকাশের সংকীর্ণতা মোচন করতে পারেন নি। তবু গ্রীসের এই কঠিন যুক্তিপ্রধান শাস্ত্রচর্চার মধ্যে লালিত হয়েও আর্কিমিডিস আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা সিদ্ধ রূপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়ে-ছিলেন। এই কারণেই তিনি পৃথিবীর মহত্তম প্রতিভা বলে স্বীকৃত। প্লেটো ও সক্রেটিসের তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীর দার্শনিক মহলে আজো তর্কের অন্ত নেই। প্রশংসা ও নিন্দা দুই বর্ষিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আর্কিমিডিস অজাতশত্রু। গ্রীক চেতনার মৌল ভ্রান্তি তাঁকে স্পর্শ করে নি।

চিঠিপত্রে কীটসের শেষের দিনগুলি

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২০ সালের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি এক রাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন কবি কীটস, স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল নয়। সর্দ্দির ধাত অত্যন্ত প্রবল। বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় প্রচণ্ড হিমের মধ্যে বসে ছিলেন গাড়ীর বাইরে আপন খুসীতে। এই বাইরে বসে থাকার অনবধনতাই যে নাইটিঙ্গেলের বন্দনার, গ্রীসীয় পাত্রের সৌন্দর্য্য পিপাসু, ধুসর হেমন্ত গোধুলির কবির এ পৃথিবীর যাত্রাপত্র এত ক্ষণস্থায়ী করে তুলবে কেউ তখন ভাবতেও পারেনি।

বাড়ীতে ফিরে ক্লান্ত দেহখানি বিছানায় এলিয়ে দেবার সময় দেখা গেল বেশ উতপ্ত, একটু পরেই প্রবল কাশির সঙ্গে বুক চিরে বেরিয়ে এল এক অঞ্জলি তপ্ত ঈষৎ কালো রক্ত, সেই রক্তের রঙ দেখে মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেলেন কীটস, চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রের পক্ষে সেই রঙ চিনতে বিলম্ব হলোনা। প্রবল হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন।

কীটস পরিবারে এই রোগ নূতন নয়। এর ভয়ালতা আর তিল তিল করে নিঃশেষ হওয়ার কথা কীটসের অজানা ছিল না। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে নিজের জীবনেরও এই রকম একটা করুণ সমাপ্তির কথা চিন্তা করেই কীটস বোধহয় এত বেশী শঙ্কিত আর সচকিত হয়ে উঠে ছিলেন, আশ্চর্য হবার কথা নয়। যে মানুষটি এ পৃথিবীর রূপ, রস, বর্ণ গন্ধ গান আকন্ঠ পান করার আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে, মশগুল হয়ে আছে হঠাৎ যদি তার সম্মুখ থেকে সেই পান পাত্র সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব মুখরিত হতাশা নিপীড়িত মুহূর্তে নিজেকে খুব রিক্ত মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীর প্রতি শিরায় শিরায় যে সৌন্দর্য্য লহরী বয়ে চলেছে, যে সৌন্দর্য্যধারার উৎসাহী অংশীদার তার জীবনের পঁচিশটি বসন্ত নব পত্র পুষ্পে শোভিত করে রেখেছিলেন সহসা অদৃষ্টের নির্ম্মম রোষে তা থেকে একেবারে দূরে সরে যাবার সময় বেদনা বোধ থাকা ত অস্বাভাবিক নয়। অসুস্থ ঈগল পাখীর মত দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটানোর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাবোধ তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই যখন চিকিৎসক জানলেন আপাততঃ ভয় পাবার কিছু নেই। এখনও যক্ষা দেখা দেয়নি, ফুস ফুস দুটো ভালই আছে। কীটস আশ্বস্ত হতে পারলেন না, নিজের অসুস্থ, শীর্ণ শরীরের দিকে, তাকিয়ে আশঙ্কায় আর অতৃপ্তিতে ভরে উঠলেন।

যাইহোক প্রতিদিনের সঙ্গে সঙ্গে কীটস একটু ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন, ডিলকে, ব্রাউনের সাহচর্য তার অসুস্থ প্রহরগুলির বিষাদ প্রাণের জয়োল্লাসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এই সময়ে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮২০ খৃঃ রিলকে লেখা এক চিঠিতে দেখি কীটসের নিজের মনেও আশ্বাসের আভাস জেগে উঠেছে। কিন্তু সে শুধুই আভাস। "I shall follow your example in looking to the future good rather than brooding upon the present ill. এর কয়েক লাইন পড়েই লিখছেন :.....I think of green fields; I muse with the greatest affection on every flower I have known from infancy—their shapes and colours are as new to me as if I had just created them with a supur human fancy. It is because they are connected with the most thoughtless and happiest moments of our lives.

লাইনগুলি পড়লে মনে হয় কোন যাত্রী তার জীবনের যাত্রা পথের শেষ পদে এসে শেষবারের মত তার আজীবনের বিচরণভূমিতে স্নেহ কোমল দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। ফ্যানি ব্রনকে লেখা চিঠিতেও সেই একই বিষাদের সুর। সেই একই গোধুলির ছায়া। If I should die, said I to myself, I have left no immortal work behind me ...... if I had had time I would have made myself remembered.

মিথ্যা আশঙ্কা। কারণ যখন এই চিঠিগুলি লেখা তখন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অধিকাংশই লেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু নিশ্চিত নির্ভয় হতে পারছেন না। কী জানি কখন নির্ম্মম ভবিষ্য দস্যুবৃত্তি করে। এই অনিশ্চয়তা, শারীরিক অপটুতার অন্ধকারের মধ্যে কীটস বাঁচতে চেয়েছিলেন প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল আলোয় আলোকিত হয়ে। কী গভীর আর নিবিড় সেই ভালবাসা। কী তার গভীর আকুতি। ফ্যানি ব্রনকে লেখা অধিকাংশ চিঠির মধ্যে প্রথম যৌবনের ভালবাসার সেই উত্তপ্ত আবেগ উপচে পড়ছে। কারণ ফ্যানি ত তার শুধু মানসী নয়; তার অস্তিত্ব, সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে স্মরণ না করে তাকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করে কেমন করে বাচবেন বা বাঁচতে চাইবেন তিনি, ১৮২০ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে ফ্যানিকে লেখা চিঠিখানি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। Health is my expected heaven and you are my Houri—this word I believe is both singular and plural—if only plural, never mind—you are a thousand of them. মার্চ্চ মাসেরই আরেকটি তারিখবিহীন চিঠিতে লিখছেন: you are always new. The last of your kisses was ever the sweetest; the last smile the brightest; the last movement the gracefullest.

আপন অনুভূতির এই সহজ এবং অকৃত্রিম প্রকাশই ফ্যানিকে লেখা চিঠিগুলিকে এমন একটা আনন্দ বিষাদঘনসম্মুন্নত মহিমা দিয়েছে যা পাঠকের মনকে সেই নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে নিবিষ্ট না করে পারেনা।

বসন্তকালের শেষাশেষি কীটসের শরীর অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হলো, চিকিৎসকও তাঁকে স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বাধা দিলেন বন্ধু ব্রাউন। তিনি অনেক বুঝিয়ে কীটসকে এই যাত্রা থেকে বিরত করে নিজেই যাত্রা করলেন স্কটল্যাণ্ডের পথে সেই শেষ বিদায়। দুজনে আর দেখা হয়নি। কীটসও ব্রাউন চলে যাবার পর স্থির করলেন ওয়েণ্টওয়ার্থ প্লেস ছেড়ে তিনিও অন্য কোথাও যাবেন, বন্ধু লে হাণ্টের সাহচর্য্য পাবার জন্য কেণ্টিন টাউনে যাওয়াই স্থির করলেন। এখানেও বেশীদিন থাকা হলো না। আবার হ্যাম্পষ্টেডেই এসে হাজির হলেন, এই সময়কার চিঠিগুলির মধ্যে একদিকে ভয়াবহ রোগযন্ত্রণা অপর দিকে আসন্ন দারিদ্র্যের সুনিশ্চিত পদক্ষেপে কীটসের মনের উদ্বেগাকুল মুহূর্তগুলো সুপরিস্ফুট। "My mind has been at work all over the world to find out what to do—I have my choice of three things—or at least two—South America or Surgeon to an Indianman—which last I think will be my fate.

(মে মাস ১৮২০) এই অতলান্ত হতাশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফ্যানি ব্রনের ব্যবহার তাঁর অন্তরের বেদনাকে দুঃসহ করে তুলল। কীটসের ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। তা মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্যালোকের মত আপনগৌরবে উজ্জ্বল, রজনীগন্ধার মত নিষ্কলঙ্ক, বৃষ্টিশেষে তৃণের রঙের মত কোমল। সুতরাং ফ্যানিও তাকে সেইরকম ভালবাসুক মনে প্রাণে কীটস তাই চাইতেন। কিন্তু ফ্লার্টিংএ অভ্যস্ত ফ্যানির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তার ব্যবহার সমালোচনার উর্দ্ধে ত নয়ই। ফ্যানির এ ব্যবহার সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রেমের হলাহল পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। খুব কম লোকই পারে। তাই ফ্যানিকে জুন মাসের এক চিঠিতে অসহ্য যন্ত্রণার দহন থেকে লিখলেন ঃ

I wish this coming night might be my last. I cannot live without you and not only you but chaste you, virtuous you.

এই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কীটসের স্বাস্থ্য যতটা ভাল হওয়া উচিত ঠিক ততটা না হলেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ৬ই জুলাই তারিখে ফ্যান্সী কীটসকে লিখলেন ঃ

I have had no return of the spitting of blood and for two or three days have been getting a little stronger ..... My physician tells me I must contrive to pass the winter in Italy.

কীটস ভাবছিলেন কী করা যায়। কবি শেলী শীতকালটা পিসাতে তাঁর সঙ্গে কাটাবার জন্য সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শেলীর চিঠি পাবার পর স্থির করলেন এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই সমীচীন। লিখেও দিলেন তাই। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ আবার প্রবল কাশি এবং সেই সঙ্গে গলা দিয়ে রক্ত ওঠা সুরু হলো। কীটস বুঝলেন ঃ আরেকটা শীত ইংল্যাণ্ডের হিমে কাটালে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ১৪ই আগষ্ট ১৮২০ খৃঃ অঃ বন্ধু ব্রাউনকে লিখলেন ঃ A winter in England would, I have not a doubt kill me; so I have resolved to go to Italy.

ঠিক এই সময়ে চিফশিলি হেডন্ একদিন কীটসকে দেখতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি তার দিনলিপিতে কীটসের অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন। সাদা জামা, সাদা চাদর, সাদা পর্দা সমেত একটি ঘরে রোগজীর্ণ, পাণ্ডুর কোটরাগত উজ্জ্বল চোখ নিয়ে কীটস শুয়ে আছেন। মুখে পাণ্ডুর হাসি। গাল দুটো অস্বাভাবিক লাল। সারা ঘরটাকে যেন একটা বিরাট কফিনের মত মনে হচ্ছিল। হেডন্ বুঝলেন এখন শুধু শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু কীটসের মনে আশার প্রদীপ তখনও মিট মিট করে জ্বলতে লাগল। ২৩শে আগষ্ট তারিখে বোনকে লিখলেন ঃ I have been improving lately and have very good hopes of.....cheating the consumption.

যাত্রার তোড়জোর সুরু হলো। আগষ্ট মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যের দিকে বেশ শীতল হাওয়া বইতে থাকে। সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। ডাক্তার ক্লার্ক রোমে চিকিৎসা করেন। তিনি সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বন্ধু সেভার্ণও সঙ্গে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী এই শিল্পী আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু ভুলে গিয়ে কীটসের শেষের প্রহর গুলি যে ভালবাসার আনন্দে ভরে দিয়েছেন তা নিসন্দেহে এক হৃদয়ের পরিচয় বহন করে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইটালীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ঢেউএর দোলায় আর আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে, সেভার্ণের চিঠি থেকে জানা যায় যাত্রা সুরুতে কবিকে বেশ সুখীই মনে হচ্ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ তা একান্তই বাইরের। তার অন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ঝড়ো হাওয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছিল তার আভাস পাই জাহাজ থেকে লেখা ব্রাউনের চিঠিতেঃ

I wish for death every day and night to deliver me from these pains and then I wish death away for death would destroy even those pains which are better than nothing.

যত যন্ত্রনাই হোক এ পৃথিবীর সঙ্গে সকল লেনদেনের হিসাব একেবারে চুকিয়ে ফলতে কারোই ভাল লাগতে পারে না। কীটসের মত জীবন রসিক সৌন্দর্য পিপাসু কবির ত নয়ই। তবু ভিন্ন ভিন্ন বিপরিতমুখী চিন্তাধারার আবর্ত্তে কখনও তার অসুস্থ মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু সেত সত্যি সত্যি তার আত্মার কামনা নয়। আর তাছাড়া মৃত্যু মানেইত ফ্যানিরনের সঙ্গে চিরকালের বিচ্ছেদ। সে যে এই রোগযন্ত্রণার চেয়েও আরো বেশী

ভয়ানক। আরো বেশী দহনকারী। পূর্ব্বোক্ত চিঠির শেষাংশে লিখছেনঃ

The thought of leaving Miss Brawne is beyond everything horrible—the sense of darkness coming over me—I eternally see her figure eternally vanishing.

শুধু কী তাই ফ্যানির হাজার হাজার টুকরো টুকরো কথা একের পর তার মনে পড়ছে। আকুলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য ফ্যানীকে ভুলতে সে কী এক কোমল যন্ত্রণা তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে পলে পলে।

ইটালীতে পোঁছে ১লা নভেম্বর তারিখে পেপলস থেকে লিখলেন On Brown I have coals of fire in my breast. It surprised me that the human heart is capable of containing and bearing so much misery. God bless her.....

নেপলসে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শেলীর চিঠি এল। খোঁজ নিয়েছেন। কেমন আছেন? তাড়াতাড়ি পিসাতে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু কতকগুলি কারণে সঙ্গে সঙ্গেই যাওয়া হলো না। কীটস্ রোমে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রোমে পোঁছেই পরিচয় পত্রসহ ডাক্তার ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করে এলেন। ডাঃ ক্লার্ক সহৃদয়তার সঙ্গে তার সাধ্যে যা সম্ভব সবই করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসাধ্য উৎসাহিত করারও চেষ্টা করতে লাগলেন। ৩০শে নভেম্বর তারিখে লেখা কীটসের শেষ চিঠিতে দেখি তিনি ব্রাউনকে লিখছেন: Dr. Clarke is very attentive to me; he says there is very little the matter with my lungs, but my stomach, he says, is very bad.

যত দিন যেতে লাগল অসাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন কীটস। তার দৈনন্দিন দৃশ্যমান জগতের সব কিছুতেই তিনি মৃত্যুর সঙ্কেত দেখতে লাগলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, যন্ত্রণায় তিনি বিপর্যস্ত হতে সুরু করলেন। সমস্ত আত্মবিশ্বাস তার হারিয়ে যেতে সুরু করল। শেষের সেই মুহূর্ত্তে ধ্রুবতারার অবিচল নিষ্কম্প আলো নিয়ে শুধু সেভার্ণ প্রতি ক্ষণে তাকে উৎসাহিত করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বুঝতে বাকী ছিল না তার প্রদীপ মিট মিট করছে। যে কোন মুহূর্ত্তে খেয়ালী হাওয়ায় নিভে যাবে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠল। প্রতিদিনই কীটসের প্রতিভাজ্জ্বল, বেদনা পীড়িত ক্লান্ত আননে মৃত্যুর কৃষ্ণছায়া নিবিড়তর হয়ে এল। এবার শুধু শেষ খেয়ায় পাড়ি দেবার প্রস্তুতি। কীটস নিজেও বুঝলেন যে পৃথিবীকে তিনি এতদিন তার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভালবেসেছিলেন, আপন করে নিয়েছিলেন আবিষ্কার করে ছিলেন দিনে দিনে, নিত্য নবভাবে তা ছেড়ে যাবার সময় এসেছে। অবশ্যম্ভাবীকে শান্তভাবে গ্রহণ করার মত মানসিক স্থৈর্য্য আর সাহসের অভাব ছিল না, সত্যম্ সুন্দরমের পূজারীর। তাঁর সমস্ত অস্থিরতা ক্ষান্ত হয়ে তিনি আত্মসমাহিত হয়ে এলেন। এবারে শুধু দিন গোনা। একজন ইংরেজ নার্স রাখা হলো। সেই সেবাময়ী স্বদেশীয় কবির শেষ মুহূর্ত্ত গুলিতে একটু শান্তি আর একটু স্নিগ্ধতার পরশ দিয়ে মধুর করে তোলার চেষ্টায় কোন কার্পণ্য করেনি। তবু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খৃঃ কীটস এক বিষণ্ণ মুহূর্ত্তে সেভার্ণকে কাছে ডাকলেন। সেভার্ণ এসে বসলেন তার বিছানার পাশে। খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন কীটস তাঁর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন তাঁর কবর লিপিটুকু টুকে রাখতে। সেভার্ণের বুঝি সেই মুহূর্ত্তে মুক্তার মত চক্ চক্ করে উঠেছিল চোখের কোণ সঞ্চিত অশ্রুজলে। চুপ করে লিখে নিলেন। Here lies one whose name was writ in water.

এর পরে কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোঝা গেল আর দুরতম আশাও পোষণ করার সময় অতীত হয়ে গেছে। ২৭ তারিখে বেলা চারটার সময়

আকুল হয়ে ডাক দিলেনঃ Severn—I—lift me up—I am dying—I shall die easy; don't be frightened—be firm and thank God it has come.

সেভার্ণ তাঁকে তাড়াতাড়ি হাত ধরে তুলে ধরলেন। বন্ধুর স্নেহনিবিড় বাহুর উষ্ণ পরশ নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কবি কীটস।

কীটসের বহুদিনের কামনা ছিল যে তাকে এমন একটা জায়গায় যেন সমাহিত করা হয় যেখানে তার কবরের উপর অসংখ্য ফুল ফুটে থেকে কবরখানি কুসুমসাজে আবৃত করে রাখবে। তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি। প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রোমের এত প্রান্তে তরুছায়াঘন শান্ত নিবিড় যে স্থানে তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কীটসের মৃত্যুর দশ সপ্তাহ পরে হাজির হলেন সেভার্ণ। আনন্দে তাঁর মন কানায় কানায় ভরে উঠল। অসংখ্য ডেইজি ফুলে ছেয়ে রয়েছে কীটসের সারা কবরখানি। সুন্দর-সাধকের যোগ্য অর্ঘ্য বুঝি মিলেছে সুন্দরী প্রকৃতির চারু হাতে।

র বী ন্দ্র র চ না সূ চী

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

বিচিত্রা ঃ পূর্বানুবৃত্তি

অ ষ্ট ম ব র্ষ ॥ শ্রা ব ণ ১ ৩ ৪ ১—আ ষা ঢ় ১ ৩ ৪ ২

শ্রা ব ণ ১ ৩ ৪ ১

প্রত্যর্পণ

বীথিকা

ভা দ্র ১ ৩ ৪ ১

যাত্রাশেষে

অপ্রকাশিত

স্বরলিপি : 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়'

স্বরলিপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

স্বরবিতান ৫৪

আ শ্বি ন ১ ৩ ৪ ১

কাঠবিড়ালী

বীথিকা

কা র্তি ক ১ ৩ ৪ ১

শরৎ

প্রান্তিক, ১৫ সংখ্যক কবিতা

অ গ্র হা য় ণ ১ ৩ ৪ ১

অন্তরতম

বীথিকা

মা ঘ ১ ৩ ৪ ১

নারী-প্রগতি

প্রহাসিনী

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে উদ্বোধন ভাষণ

দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, সাহিত্যের পথে : পরিশিষ্ট

সাহিত্যের পথে চৈত্র ১৩৬৫ সংস্করণ

স্বরলিপি : 'আমার নয়ন তব নয়নের'

স্বরলিপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

স্বরবিতান ৫৪

ফাল্গুন ১৩৪১

আদিতম

বীথিকা

চৈত্র ১৩৪১

পলাতকার প্রতি

প্রহাসিনী। পলাতকা

বৈশাখ ১৩৪২

অতীত বাণী

শেষ সপ্তক, দশ সংখ্যক কবিতা

স্বরলিপি : 'আমার বনে বনে'

স্বরলিপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

স্বরবিতান ৫৪

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

পরিণয়মঙ্গল

প্রহাসিনী

স্বরলিপি : 'দূরের বন্ধ সুরের দূতীরে'

স্বরলিপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

স্বরবিতান ৫৪

আষাঢ় ১৩৪২

নিমন্ত্রণ

বীথিকা, পরিবর্তিত

নবম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৪২—আষাঢ় ১৩৪৩

শ্রাবণ ১৩৪২

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত পত্র, 'শিক্ষাবিধি সম্পর্কে তোমার সঙ্গে'। ১৫ই জুলাই ১৯৩৫

শিক্ষা, ১৩৪২ সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৪২

বর্ষামঙ্গল

গান : ১। জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে ২। কী বেদনা মোর জানো সেকি

আশ্বিন ১৩৪২

হৈ হৈ সঙ্ঘের জাতীয় সঙ্গীত

১। না গান গাওয়ার দল ২। কাটাবনবিহারিনী সুরকানা দেবী

৩। পায়ে পড়ি শোনো ভাই ৪। ও ভাই কানাই

কার্তিক ১৩৪২

নিঃস্ব

বীথিকা

অগ্রহায়ণ ১৩৪২

বাসর ঘর

শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র, 'কিছুদিন আগে তোমার 'বাসর ঘর' বইখানি'। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

অপ্রকাশিত

পৌষ ১৩৪২

জন্মদিনে : 'তোমার জন্মদিনে আমার কাছের দিনের'

অপ্রকাশিত

মাঘ ১৩৪২

পথের মানুষ : 'অতিথিবৎসল, ডেকে নাও'

পত্রপুট

ফাল্গুন ১৩৪২

নানা কথা

মূলতঃ ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ চলতি ভাষায় রূপান্তরিত।

বিচিত্র প্রবন্ধ, চৈত্র ১৩৪২ সংস্করণ

চৈত্র ১৩৪২

আঁখি সঙ্গম

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ : 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'। হস্তলিপিতে মুদ্রিত

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

খাটুনীর মাহাত্ম্য

[শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত] পত্র, 'ডিগনিটি অফ্ লেবার কথাটি ফাঁকি।' ১০ জুন ১৯৩১

অপ্রকাশিত

স্বর্গীয়া কমলা নেহরু

'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত

অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩৪৩

শেষের মৌন : 'কথার উপরে কথা চলেছে'

পত্রপুট

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

কলাবুদ্ধি ও কলবুদ্ধি

পত্র, 'এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবেসেছি'। ১৫ মাঘ ১৩৩৯

বিচিত্র প্রবন্ধ, চৈত্র ১৩৪২ সংস্করণ পৃঃ ১৭৫-১৮০

আষাঢ় ১৩৪৩

শেষ প্রহরে

শ্যামলী, ঈষৎ পরিবর্তিত

দশম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৪৩ — আষাঢ় ১৩৪৪

শ্রা ব ণ ১ ৩ ৪ ৩

রবি-বাসর

'রবি-বাসরের' সপ্তমবর্ষের সপ্তম অধিবেশনে শ্রদ্ধাভিনন্দনের উত্তরে প্রতিভাষণ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত
অপ্রকাশিত

ভা দ্র ১ ৩ ৪ ৩

বিদায়-বরণ

শ্যামলী

আ শ্বি ন ১ ৩ ৪ ৩

পত্র-কথা

শ্রীরাণী মহলানবীশকে লিখিত
পথে ও পথের প্রান্তে, ২, ৩ ও ৪
২ সংখ্যক পত্র অংশতঃ বর্জিত

কা র্তি ক ১ ৩ ৪ ৩

রবিবাসর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিচিত্রা-সম্পাদককে লিখিত পত্র। 'আজ তোমার চিঠি পেলুম...'। ১ আশ্বিন ১৩৪৩
অপ্রকাশিত

অ গ্র হা য় ণ ১ ৩ ৪ ৩

শরৎচন্দ্রের প্রতি

পত্র। "তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের....."। ২৫ আশ্বিন ১৩৪৩
অপ্রকাশিত

ব্রাউনিং পত্রাশিকা

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত পত্র। 'ব্রাউনিঙের কবিতাগুলিকে তুমি যে... "। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬।
অপ্রকাশিত

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৪ ৩

ছাত্রদের প্রতি

শিক্ষা, ছাত্র সম্ভাষণ

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

স মা লো চ না

বিশ্বভারতী পত্রিকা, অবনীন্দ্র সংখ্যা ॥ ষোড়শ বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা) ॥ সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন। মূল্য তিন টাকা।

ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকার দু'একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে; সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, বিশ্বভারতী পত্রিকার অবনীন্দ্র সংখ্যা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিয়াছে। আমাদের মনে কিসের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল? এই বিশেষ বিশেষ স্মারক সংখ্যাগুলিতে আমাদের দেশের মনীষীগণ সম্বন্ধে বহু তথ্য ও চিন্তা লাভ করিতে পারিব শুধু তাহাই নহে, যে ভাবে সেগুলি আমাদের নিকটে পরিবেশিত হইবে তাহার ভিতরে বাঙ্গালী সাময়িক পত্রিকা-সম্পাদনার মানকেও একটা শোভন শ্রদ্ধার্হ স্তরে উন্নীত দেখিতে পাইব এই আকাঙ্ক্ষাও আমরা পোষণ করিয়াছি। বিশ্বভারতী পত্রিকার আলোচ্য অবনীন্দ্র সংখ্যা এই দুই দিক হইতেই আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছে। এখানে বিষয়বস্তুর গৌরবকে কোনও-রূপে লাঘব না করিয়াও এখানকার সুরুচিসম্মত অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মহিমাকেও একান্ত অপ্রধান করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে না। শুধুমাত্র ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে না হইয়া আমাদের একটি সাময়িকপত্র এইরূপ সমুন্নত সৌষ্ঠব ও মহিমা লাভ করুক ইহা আমাদের কাম্য ছিল। সম্পাদক শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে উচ্চমানবোধ ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত।

বিষয়বস্তুর প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতকগুলি চিঠিপত্র স্থান পাইয়াছে। এই চিঠি-পত্রগুলি অতিসহজলভ্য নহে, এগুলিকে বিভিন্ন আকর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশ চিঠিই ছোট ছোট চিঠি; কিন্তু এই ছোট ছোট চিঠিগুলির অল্প দু'একটি কথার ভিতর দিয়াই স্থানে স্থানে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পিমনটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যেমন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে লিখিত দ্বিতীয় চিঠিখানি 'কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা রূপদক্ষ এবং রসিকও বটে আমি এসম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি—আজ সকাল থেকে আলোর একটা সাদা পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দুজনে দুটী পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বল—ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না।' শ্রীযুত নন্দলাল বসুকে লিখিত তৃতীয় পত্রখানিতে দেখি, 'গিরিমাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে রূপের পরশ এবং রং এর আভা তার উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী।' উভয়ক্ষেত্রেই টুকরা কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে শিল্পিরূপে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য ও মননবৈশিষ্ট্য; আবার তাহাকে প্রকাশ করিবার যে ভঙ্গি তাহার ভিতরেও অবনীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর আভাস মিলিবে।

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় যতগুলি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার ভিতরে অধিকাংশই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্পের বিশ্লেষণ ও আস্বাদন রূপে। অবনীন্দ্র নাথের চিত্র-

শিল্প সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ রহিয়াছে; একটি শ্রীনন্দলাল বসুর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ', অপর শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'অবনীন্দ্রনাথ'। উভয় প্রবন্ধেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন দিক লইয়া বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে সুলিখিত পাঁচটি প্রবন্ধে; 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, 'কথক অবনীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅমলেন্দু বসু, 'ভাষা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅজিত দত্ত। 'যে দেখতে জানে' প্রবন্ধে সরসভঙ্গিতে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীলীলা মজুমদার। শুধু 'আলোর ফুলকি'কে অবলম্বন করিয়া অবনীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রতিটি লেখারই বৈশিষ্ট্য এই যিনিই যে বিষয়ে লিখুন, সকলেই অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রতিভার সম্বন্ধেই আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই সমগ্রতার ভিতরে তাঁহার সাহিত্য-শিল্প ও চিত্র শিল্প যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে, অর্থাৎ ছবি যে তিনি শুধু আঁকিতেন না, ছবি যে তিনি আবার লিখিতেন—এই গূঢ়সত্যটি কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। সব জুড়িয়া তাই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভার সমগ্র পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সংখ্যার গ্রন্থ পরিচয়ের অংশটিও অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া প্রথম সমালোচনা ইণ্ডিয়া মিউজিয়ামের চারুকলা বিভাগ হইতে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অঙ্কিত ছবির সঙ্কলন 'Abanindranath Tagore: His Early Works' সম্বন্ধে। এই আলোচনার ভিতর দিয়াও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি জনপ্রিয় বইয়ের সাম্প্রতিক প্রকাশ অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। তৃতীয়ভাগে পাই অবনীন্দ্রনাথের চরিত্র ও স্মৃতিচিত্র সম্বন্ধে লিখিত কয়েকখানি বইয়ের আলোচনা। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর 'স্মৃতিচিত্রে' অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিও উজ্জ্বল।

সংখ্যাটিকে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্য-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে দুইটি সংযোজনা, প্রথমটি শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু সঙ্কলিত 'অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী', দ্বিতীয়টি শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী।' দুইটি সঙ্কলনেরই পশ্চাতে যে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় রহিয়াছে তাহা অকুণ্ঠ প্রসংশার দাবী রাখে। অবনীন্দ্রনাথ বাঙলা বই এবং প্রবন্ধও যে এত লিখিয়াছেন তাহা একসঙ্গে এমন করিয়া না দেখিলে ধারণা হইত না। ভবিষ্যতে যাঁহারা অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অধ্যয়ন আলোচনা করিবেন এই সঙ্কলন দুইটি তাঁহাদের সর্বথা সহায়ক হইবে।

আলোচ্য সংখ্যায় আটখানি পূর্ণ পৃষ্ঠা চিত্র সংযোজিত হইয়াছে; ইহার ভিতরে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমুকুল চন্দ্র দে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের দুইখানি একবর্ণের প্রতিকৃতি, আর বাকি ছয়খানি হইল অবনীন্দ্রনাথের বহুবর্ণে অঙ্কিত ছয়খানি চিত্র। চিত্রগুলির নির্বাচন এবং নিখুঁত মুদ্রণ পত্রিকাখানির উচ্চমানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ ।। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা শাখা। মূল্য ঃ আড়াই টাকা।

'সর্বোদয়' 'ভূদান' প্রভৃতি কথা বর্তমান ভারতে লেখায় চিন্তায় ও কাজে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতঃই ভারতের জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদ ব্যক্তিরা এসকল বিষয়ে জানতে খুবই আগ্রহশীল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত চিন্তাধারা ও বিন্যাস 'গান্ধীবাদ' নামে বর্তমান রাজনৈতিক সাহিত্যে আলোচিত হচ্ছে।' সর্বোদয়, ভূদান, শ্রমদান, প্রভৃতি গান্ধীজির নিজস্ব দেওয়া নাম। এগুলির কোনো সংজ্ঞা এ পর্যন্ত সাঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। সমাজব্যবস্থা ও তার আদর্শ, মানুষ ও আদর্শ মানুষ, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ মানুষ কিভাবে গঠিত হবে ও কি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক—এইসব চিন্তা বহু যুগ ধরে চিন্তাশীল মনীষী ও যুগ প্রবর্তকেরা করেছেন। বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ মানুষ সমাজে উপস্থাপিত হবার পর হতে শ্রেণীহীন সমাজ, শাসনমুক্ত সমাজ প্রভৃতি বহু সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিঃসন্দেহে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স বহু গবেষণা ও পর্যালোচনার পর সমাজতন্ত্রে শ্রেণীহীন সমাজ যে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ সে বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেন। সেই আদর্শে পরিচালিত হয়ে আজকের পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের জন্য সচেষ্ট। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরেও প্রায় সবদেশেই মার্কসের ও লেনিনের দর্শন, বিশ্লেষণ ও পথ বহুজনকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। মার্কস্-লেনিন প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের পথে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও সেই রাষ্ট্রের কঠোর শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি মানবমুক্তির সঠিক পথ কিনা তাহাও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব বহুদিনের। তাই সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীও যুক্তি কিছু নূতন নয়। সর্বোদয় কর্মীরা ও বিনোবাজীর ভূদান কর্মীরাও শাসনমুক্ত সমাজ প্রবর্তনের জন্য চিন্তা ও কাজ করে চলেছেন।' সর্বোদয় কি পরিমাণে সার্থক আদর্শ তা শুধু ইতিহাসই প্রমাণ করবে। তবু এবিষয়ে বাংলা পুস্তকের অভাব আছে। এজন্য লেখক শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই পুস্তকের অবতারণা।

রাষ্ট্র ও তার উৎপত্তি সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, সমাজতন্ত্র, তার বিভিন্ন ধারা ইত্যাদি অনেক বিষয় লেখক উপস্থিত করেছেন ও স্বল্প পরিসরে যুক্তিখণ্ডন- করে সর্বোদয় আদর্শের রূপরেখা দেবার প্রয়াস করেছেন।' দুঃখের বিষয় ছাত্রসুলভ রচনায় পল্লবগ্রাহিতা ও শাসনমুক্ত সমাজের সম্যক উপলব্ধির অভাব এই পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করেছে। একশো ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে—বহু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিন্তা ও বাবস্থা ও কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা এবং তার দোষত্রুটির তালিকা উপস্থিত করে—ভারতবাসীর অর্থনীতিক সামাজিক বনিয়াদ, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সম্পর্কে নীরব থেকে কিভাবে শাসনমুক্ত সমাজের বক্তব্য উপস্থিত করা সম্ভব তা বহু পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে। আসলে সর্বোদয় বা শাসনমুক্ত সমাজ বলতে কি বোঝায় লেখকের নিজের কাছেই সেটি সুস্পষ্ট নয়। ফলে বহু পুস্তক পাঠের মধ্যে লেখক নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ও কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করতে অক্ষম হয়েছেন।' কেহই লেখকের নিকট 'থীসিস্' আশা করেন না। কিন্তু সহজভাষায় তাঁর বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাঠকদের পক্ষে দাবী করা স্বাভাবিক।' পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী থাকায় শাসনমুক্ত সমাজ সম্পর্কে কোনো কোনো পাঠকের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণয়ী পঞ্চক। সুশীল রায়। নতুন প্রকাশক, ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্যসাহিত্যের যে বিচিত্র উন্মেষ ঘটেছিল, তার প্রধান বাহন ছিল মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা কাব্য। মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবি তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছেন। এই যুগের আখ্যায়িকা কাব্যের উৎস ছিল পুরাণ ও ইতিহাস। বীরযুগের উন্মাদনা বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয় ভাবোদ্দীপনার রঙে রঞ্জিত হয়ে এযুগের কাব্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। নবযুগের চিন্তা-চেতনার আলোকে পুরাণ ও ইতিহাস নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আখ্যায়িকা কাব্যের এই যৌবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিহারীলালের আত্মতন্ময় ভাবসাধনা নবযুগের লিরিকের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্য দিয়ে এক সময় বাঙালি কবিরা কবি ও কথক উভয়েরই দাবী মিটিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করল। উপন্যাসের এই পূর্ণ পরিণতির লগ্ন থেকে আখ্যায়িকাকাব্যের রসস্রোতও স্তিমিত হয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যরচনার প্রথম প্রহরে আখ্যায়িকাকাব্য লেখার চেষ্টা করেছিলেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রকাব্যজীবনে এই পর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবর্ধমান গীতি-প্রবণতা আখ্যায়িকা কাব্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথ মধ্যবয়সে 'কথা' ও 'কাহিনী' লিখেছেন। আখ্যায়িকা কাব্যের দীর্ঘমন্থর বিন্যাস ও কথাবিস্তার এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু পুরাণ ও ইতিহাসের এক একটি নাটকীয় ও ভাবঘন মুহূর্তকে তিনি রসরূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্র সমকালীন ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কারো কারো কবিতায় কাহিনী কাব্য লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ কবিরা কিছু কিছু কাহিনীকাব্য লিখেছেন।

কাব্যের এই বিশেষধারাটি রবীন্দ্রনাথের তেমন সমর্থন পায়নি, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছে। এ যুগের কবিদের কাব্যেও এই ধারাটি স্বীকৃত হয়নি। অথচ এই ধারার মধ্যে বহু অনাবিষ্কৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র বিদ্যমান। সেই অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রটি যদি এ কালের কোন বলিষ্ঠ কবিপ্রতিভার নবীন কর্ষণায় সোনার ফসলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তা হলে বাংলা কাব্যের এই অনাদৃত দিকটি যে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করবে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। এ যুগের আখ্যায়িকাকাব্য ঊনিশ শতকের আখ্যায়িকা কাব্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর শিল্পচেতনারই পরিচয় দেবে। কারণ মাঝখানে আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভূমি ও জ্যোতির্ময় মানসলোক। কবি সুশীল রায়ের 'প্রণয়ী পঞ্চক' এই নবীন প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। মহাভারত থেকে স্বল্পপরিজ্ঞাত পাঁচটি কাহিনী নির্বাচিত করে, তিনি তাদের নতুন রূপ দিয়েছেন। মহাভারতের মূলধারার সঙ্গে যে সব অজস্র শাখাকাহিনীর স্রোতধারা মিশেছে, তার অনেকগুলি স্বল্প পরিচিত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য তাদের কম নয়। কবি সুশীল রায় যথার্থ রূপসন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে এইরকম পাঁচটি কাহিনী আলোকিত করেছেন। 'নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী'-র মধ্যে চিরন্তন হৃদয়েরই আনন্দ-বেদনা ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। তাই পুরাতনী হয়েও নায়িকাদের বাসনার রং আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন ও বেদনার অশ্রুসম্পাত চিরকালের সত্য হয়ে আছে। কবি নারীহৃদয়ের সেই চিরন্তন আবেদনটিই পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করেছেন।

কাহিনী-কাব্য রচনায় কবি ও কথকের এক সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। এই দ্বিবিধ শক্তির

সমন্বয়ের অভাবে এই জাতীয় কাব্যে দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়। কবি সুশীল রায় কাব্য ও কথাসাহিত্য—উভয়ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দবিচরণ করেছেন। তাই কবিকল্পনা, বর্ণসমৃদ্ধি বর্ণনা ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে চরিত্রচিত্রণ, সংলাপরচনার নৈপুণ্য ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতার ইঙ্গিত সমন্বিত হয়েছে।

মহাভারতের পঞ্চনায়িকার বৃত্তান্ত পাঁচটি আখ্যায়িকা-কাব্যে সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু কবি সর্বত্র মহাভারতের অনুসরণ করেন নি। মহাভারতীয় কাহিনীকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। নায়িকাচিত্তের বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রেমরহস্যের সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতগুলি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। 'প্রণয়িনী সুলভা' আখ্যায়িকা শান্তিপর্ব থেকে (সুলভাজনকসংবাদ) গ্রহণ করা হয়েছে। মহাভারতীয় কাহিনীতে মোক্ষতত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ এই কাহিনী শুনিয়েছেন। মহাভারতের সুলভা সন্ন্যাসিনী, তত্ত্বদর্শিনী—কাহিনীটির মধ্যেও তত্ত্বের হিমশীতল তুষারস্তূপ। আধুনিক কালের কবির লেখনীস্পর্শে সেই তুষারস্তূপ বিগলিত হয়েছে। কবি তত্ত্বের গহনে মানবীয়তার উষ্ণ প্রস্রবণটি আবিষ্কার করেছেন। মহাভারতের তত্ত্বদর্শিনী সন্ন্যাসিনী এখানে রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত হয়েছেন। সন্ন্যাসিনীর হৃদয়তন্ত্রীতে তাই নবজীবনের নিঃশব্দ ঝংকার :

সহসা উঠেছে জেগে শততন্ত্রী বীণার মতন
শরীরের সব তার। তারে তারে অপূর্ব কম্পন
চমকিত করে তাকে। ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী
নিঃসঙ্গ জীবনে তার অকস্মাৎ হয়েছে সঙ্গিনী,
নূপুর বিহীন পায়ে বাজে তাই নিঃশব্দ ঝংকার
প্রতি পদপাতে বাজে শিরায় শিরায় শত তার।

'প্রণয়িনী সুলভা' আখ্যায়িকা-কাব্যে যেমন সুলভা চরিত্রকে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি মহাভারত-বহির্ভূত আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি কাহিনীকে আরো রসঘন করে তুলেছেন। রাজ মহিষী মালতী চরিত্র মূল মহাভারতে নেই। কিন্তু এই উপেক্ষিতা নারীর মর্মবেদনাটি যত্ন করে কাহিনীর নাটকীয়তা বর্ধিত হয়েছে। এইভাবে মহাভারতের একটি তত্ত্ব-কাহিনীকে আধুনিক কবি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

'সুদ্যু' ও 'শ্রুবাবতী'র কাহিনী দুটি মহাভারতের শল্যপর্ব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কুণিগর্গ মুনির মানসকন্যা সুভ্রর কাহিনী (শল্য পর্বের ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বৃদ্ধকন্যার তীর্থ কাহিনী) মূল মহাভারতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা। সামান্য উপকরণকে কি ভাবে সার্থক শিল্পকর্মে পরিণত করা যায়, তার প্রমাণ এই কবিতাটি। এখানেও মূলের বিবৃতিধর্মী আখ্যায়িকাকে নাটকীয় করা হয়েছে। বৃদ্ধাকুমারীর পাতিকামনাকে নিয়ে ঋষিকুমারদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের চিত্রটি স্বাভাবিক ও উপভোগ্য হয়েছে। বৃদ্ধা তাপসকুমারীর মধ্যে তরুণী প্রেমিকার সৃষ্টি কবির একটি বিশিষ্ট রচনা। শ্রুবাবতীর কাহিনী (শৈল্য পর্বের একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় বর্ণিত) প্রেমের দুঃসহ তপশ্চর্যার কাহিনী। প্রণয়াস্পদকে পাওয়ার চেয়েও বীর্যদীপ্ত প্রেমাদর্শই এখানে বড়। ভারত প্রেমকথার এই ধ্রুপদী মহিমাই কবিতাটিতে রূপায়িত হয়েছে।

'প্রণয়ী উর্বশীর'-র আখ্যায়িকা এই কাহিনী পঞ্চকের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত। অভিসারিকা উর্বশীর সঙ্গে অর্জুনের কথোপকথন অংশটি হৃদয়রাগে রঞ্জিত ও নাটারসে সমৃদ্ধ। মহাভারতে (বনপর্বের ষটচত্বারিংশত্তম অধ্যায়) উর্বশী বার্থমনোরম হয়ে অর্জুনকে ক্লীবত্বের অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক কবি এই অংশকে সম্মার্জিত ও রোমান্টিক করে তুলে-

ছেন। প্রেমবেদনায় রোমান্টিক সংরাগে এই অংশটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে ঃ

এযে তৃপ্তি কতখানি অপমানিতের, অপমানে
জর্জর জীবন যার একমাত্র সেই শুধু জানে।
শেষবার চেয়ে দেখো জ্বলন্ত এ যৌবনসম্ভার,
ব্যর্থতার ভাগ নাও, নাও অতৃপ্তির উপহার।

মহাভারতের উর্বশী প্রতিহিংসাপরায়ণা, কামনাময়ী স্বর্গনটী, আলোচ্য আখ্যায়িকার উর্বশী প্রেমবিধুরা যুবতী। পদাহতসম্মানের তীব্রতর অভিযোগের চেয়ে করুণমধুর মিতভাষণই এই চরিত্রটির সর্বশেষ ফলশ্রুতি ঃ 'দিয়ে গেলে অসম্মান, পরিবর্তে নাও প্রেম-প্রীতি।'

পাঁচটি আখ্যায়িক কাব্যের মধ্যে 'প্রণয়িনী মাধবী' কাহিনীটিই শ্রেষ্ঠ। মহাভারতে (উদ্যোগপর্বের পঞ্চাধিক-শততম থেকে বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় পর্যন্ত গালব-মাধবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে) মাধবীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্তই পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের নারী-চরিত্রকে কবি এ যুগের ভাবাদর্শে রচনা করেছেন। মহাভারতের মাধবীকে কোনো একজন ব্রহ্মবাদী বর দিয়েছিলেন যে, সে প্রতিবার প্রসবের পর 'কন্যাভাব' প্রাপ্ত হবে। সুতরাং মাধবী বিনা দ্বিধায় গালবের কথায় স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গালব যখন গুরুদক্ষিণা সম্পন্ন করে মাধবীকে পিতার কাছে রেখে এলেন, তখনো মাধবীর মনে কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি। মাধবীকে সম্পূর্ণ নতুন করে রচনা করেছেন একালের কবি। মহাভারতের মাধবী প্রাণহীন, গালবের দুরূহ গুরুদক্ষিণা পূরণ করার যন্ত্রমাত্র। এযুগের কবির কাছে এ কাহিনী নির্মম, নারী-নির্যাতনের নিষ্ঠুরতম রূপ এর প্রতিটি ছত্রে রক্তলেখায় চিহ্নিত। এ কালের কবি সহানুভূতি ও সুগভীর মমতা দিয়ে মাধবী চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। গালবের প্রতি অচরিতার্থ ও অবরুদ্ধ প্রেম, অনিচ্ছাকৃত আত্মদানে ক্লেদাক্ত অনুভূতি ও পিতৃপরিচয়হীন সন্তান চতুষ্টয়ের কাছে লজ্জা-সঙ্কুচিতা জননীর স্বীকৃতি মাধবী চরিত্রকে অনন্যসাধারণ মানবীয় মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সিদ্ধকাম গালব যখন মাধবীর কাছে কৃতজ্ঞতাস্বীকার করে বিদায় প্রার্থনা করছেন, তখন বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনা ও ব্যর্থজীবনের হাহাকার যেমন করুণ, তেমনি মর্মস্পর্শী ঃ

মানুষের চেয়ে বড় যদি ধ্যান, এ মুহূর্তে তবে
সে ধ্যান ধূলায় হোক ধূসরিত। তুমি কি কেবলি
আমাকে ভেবেছ পণ্য, এর বেশি কিছুই ভাবনি?

বলাবাহুল্য কবি এখানে নারীজীবনের দুঃসহ অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে নতুন মাধবী রচনা করেছেন। এখানে কবি ও কথকের শিল্পকৃতিত্ব চূড়ান্ত সীমায় অরোহণ করেছে। 'ড্রামাটিক মনোলগ'-রীতির প্রয়োগটি এখানে সার্থক হয়েছে। মহাভারতীয় নায়িকাচরিতকে কবি-কথক সুশীল রায় যে নবীন রূপমূর্তি দিয়েছেন, তার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এই বিলুপ্ত পথটি একালের তরুণতর কবিরা সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করলে লাভবানই হবেন।

রথীন্দ্রনাথ রায়